ভুবনজয়ী নারী
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

নাদিয়া বুক কর্ণার

ইসলামী টাওয়ার

দোকান নং ৭, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০১৯২০৫৭১৮৫
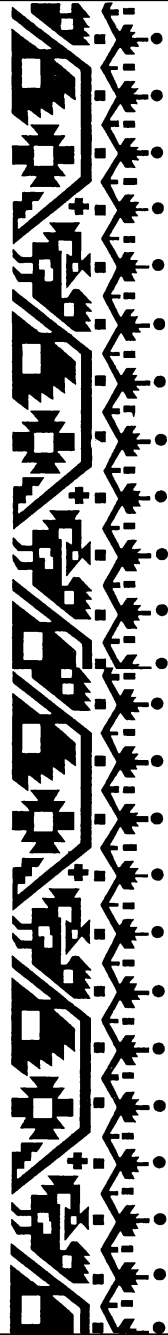
ভুবনজয়ী নারী

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, ঢাকা, খতীব, সি.এন্ড.বি. স্টাফ কোয়ার্টার জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা

প্রকাশনায় : নাদিয়া বুক কর্ণার ▪
প্রকাশকাল : ১২.১২.২০০৬ঈ. ▪ প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার, দি লাইট

মূল্য ঃ ৮০ টাকা মাত্র।

কিছু কথা

সবার একান্ত সহযোগিতায়
আমাদের প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে আরও একটি নতুন
বই। বইয়ের নাম **'ভুবনজয়ী নারী'**।
আমাদের জন্য এই বইটি লিখেছেন
এ সময়ের ইসলামী সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক
শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন।
পাঠক! এ বইটি সর্ম্পকে আমার ব্যক্তিগত কোন মন্তব্য নেই।
বইটি কেমন! এই বিচার পাঠকের উপরে ছেড়ে দিলাম।
সবার সুখময় জীবন কামনায়।

আল্লাহ হাফেজ

মুহাম্মদ মাসউদুল হাছান

নাদিয়া বুক কর্ণার ■ ৩০ নভেম্বর' ০৬

প্রবেশিকা

ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক রহমত-এর সম্পাদক সুহৃদ মনযুর আহমাদের এক রকম চাপাচাপিতেই নারী বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। লেখাগুলো যত্নসহ সংরক্ষণ ও সংকলন করেছেন আমার জীবনসঙ্গিনী দিলরুবা উম্মে আদীব। সুতরাং এই গ্রন্থের সকল কৃতিত্ব তাঁদের। আর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে থাকা সব ভুল ও অসঙ্গতির জন্যে দায়ী আমার অযোগ্যতা।

দু'আর মুহতাজ
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
১১.১১.২০০৬ঈ.
ঢাকা॥

সূচিপত্র

বীরাঙ্গনার রুদ্ররূপ

•••

যেসব শহীদের পবিত্র লহুর রস সিঞ্চনে পত্র-পল্লবিত হয়ে ওঠেছিল ইসলাম নামের শান্তিবৃক্ষ– অতঃপর তার শীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল তাপিত পৃথিবীর যন্ত্রণাদগ্ধ নির্যাতিত নিপীড়িত আদম সন্তানেরা– সেইসব শহীদানের মধ্যে অন্যতম বীরযোদ্ধা হযরত হামযা (রা.)-এর নাম আমরা সকলেই জানি। প্রিয়তম নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয়তম চাচা, হৃদয়বান বন্ধু, নেতা আবদুল মুত্তালিবের বীর্যবান পুত্র হযরত হামযার বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ, ইলাহী পতাকার মর্যাদা রক্ষার তাগিদে বুকের তপ্ত খুন ঢেলে দিয়ে মানবতার, শুধুই আল্লাহর তরে গোলামী ও দাসত্বের নবতর সংবিধান প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। অধিকন্তু হামযা (রা.)-এর রক্তলাল শরীরের পাশে দাঁড়িয়ে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অশ্রুবিসর্জনের ব্যথাদীর্ণ কাহিনী এখনো আমাদের চেতনার বদ্ধদরিয়ায় উত্তেজনার ঢেউ তোলে, ভাবহীন মৃতহৃদয়ে জ্বালিয়ে দেয় নয়া বিপ্লবের অবিনাশী চেরাগ। কিন্তু আমরা ঘুণাক্ষরেও স্মরণ করি না নেতা আবদুল মুত্তালিবের সেই বীরাঙ্গনা দুলালীকে– যাঁর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ জ্ঞান-পাণ্ডিত্য, শিল্পনন্দিত ভাষা–মাধুর্য, পবিত্র কুরআনের বিমল ইলম, শেকড়স্পর্শী বলিষ্ঠ ঈমান হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র আত্মাকে আমোদিত করে রাখত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁর পরশে এসে অনুভব করতেন হারানো মায়ের প্রীতিভরা গন্ধ, পিতা আবদুল্লাহর অমিততেজ নৈতিকতার উষ্ণ-পরশ।

বীর হামযা (রা.)কে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করে দেয়া হয়েছে। বেদনায় স্তব্ধ স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! বললেন : যদি ফুফু সাফিয়্যার কষ্ট না হতো এবং আমার পর এটি কোন আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবার আশংকা না থাকতো তাহলে হামযার এই বিকৃত কর্তিত রক্তাক্ত লাশ আমি এভাবেই মাটির উপর রেখে দিতাম আর বন্য জন্তুরা এসে তাকে খেয়ে যেত।

ভাই শহীদ হয়েছেন। জীবন দিয়েছেন আল্লাহর জন্যে। সাফিয়্যা (রা.) সংবাদ শোনে ছুটে এসেছেন রণাঙ্গনে। কিন্তু একজন কোমলপ্রাণ নারীর জন্যে কি আপন ভাইয়ের এই ভয়ঙ্কর শহীদী লাশ দেখা– অতঃপর স্থির থাকা সম্ভব! পুরুষ যেখানে বিদ্রোহী নারী সেখানে ক্রন্দিনী এইতো নারীর ধর্ম। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাপুত্র যুবাইরকে বললেন : তোমার মাকে ঘরে ফিরে যেতে বল। যুবাইর (রা.) বললেন : মা, আল্লাহর নবী তোমাকে ঘরে ফিরে যেতে বলছেন।

: কেন? আমার ভাইকে শহীদ করা হয়েছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। তার বুক চিরে কলিজা বের করে নিয়েছে দুশমনরা! এইতো...

: মা, তুমি সইতে পারবে না!

: কেন, আমার ভাই জীবন দিয়েছে আল্লাহর জন্যে! আমি আমার ভাইকে দেখব। আল্লাহর নামে ধৈর্য ধরব! তাঁরই কাছে প্রতিদান চাইব!

: যেও না ওদিকে সাফিয়্যা! বাধা দিলেন আনসার সাহাবীগণ!

: আমি যাব! মুত্তালিব-কন্যার রুদ্রকঠিন উচ্চারণ...

এগিয়ে গেলেন 'আল্লাহ ও তাঁর নবীর বাঘ' উপাধিতে ভূষিত রক্তাক্ত হামযার কাছে। হৃদয় প্রত্যয়ী! অসীম ধৈর্যের বাঁধনে আঁটা। কিন্তু চোখ! দাতা হাতেমের মত অবিরাম বিলিয়ে যেতে লাগল বহতা বেদনার তপ্ত জল। পাশে দাঁড়ানো স্বয়ং আল্লাহর নবী। কাঁদছেন তিনিও। সঙ্গে কাঁদছেন নন্দিনী ফাতিমা (রা.)! অথচ কারো কণ্ঠেই কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কিসের? আল্লাহর পথে, আল্লাহর তরে যুদ্ধ করা সেতো নারী-পুরুষ উভয়েরই কর্তব্য। পুরুষ সে কর্তব্য পালনে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয় আর নারী তার হৃদয়ে জ্বালিয়ে রাখে প্রেরণার মশাল।

অবশ্য সাফিয়্যা (রা.) শুধু প্রেরণার মশাল ধরেই তৃপ্ত হননি। সন্তুষ্ট থাকেননি ভীরু জীবনে। খায়বার যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সাথে রণাঙ্গনে

গিয়েছেন। শক্তি যুগিয়েছেন। সাহসের চেরাগ জ্বেলে ধরেছেন মুজাহিদ শিবিরে। মুজাহিদদের সেবা-নার্সিং ও খাবার তৈরিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। আর স্বামী সন্তানকে তো জিহাদে পাঠাতে কখনোই কার্পণ্য করেননি। কিন্তু এরচে'ও বড় কথা নিজ হাতে শত্রুর জান কবজ করার গৌরবও তিনি অর্জন করেছিলেন পবিত্র মদীনায়।

ঘটনাটি ছিল এমন– হযরত সাফিয়্যা (রা.) নিজেই বর্ণনা করেন : 'আমি প্রথম নারী– যে নিজ হাতে কোন শত্রুকে হত্যা করেছে। ঘটনাটি ছিল খন্দক যুদ্ধকালের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদ সাহাবীগণকে নিয়ে খন্দকে চলে গেছেন। মদীনার সুরক্ষিত কেল্লায় রেখে গেছেন নারী ও শিশুদেরকে। তাদের সাথে রেখে গেছেন প্রিয় নবীজীর সভাকবি হযরত হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা.)কে। এরই মধ্যে এক ইহুদী কেল্লার প্রাচীর টপকে নারীদের অন্দর দেশে ঢুকতে চেষ্টা করছিল। বিষয়টি হযরত সাফিয়্যা (রা.) লক্ষ্য করলেন। তাই হযরত হাস্‌সান (রা.)কে ডেকে বললেন : এই ইহুদীটাকে হত্যা করে ফেলুন। আমার আশংকা হচ্ছে, সে আমাদের সম্ভ্রমের উপর হামলা করতে পারে। আর যদি শত্রুদেরকে বলে দেয় আমাদের সংবাদ...।

: আমি পারব না! হাস্‌সান বললেন!

: কেন পারবেন না? ওতো বেঈমান!

: আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! যদি শত্রুকে হত্যা করার মত শক্তি ও সাহস আমার থাকতো তাহলে তো আল্লাহর নবীর সাথে রণাঙ্গনেই থাকতাম।

: তাহলে আমিই দেখছি...

সাফিয়্যা একটি কঠিন শক্ত লাঠি সংগ্রহ করলেন। দৃঢ়পদে নেমে এলেন উঁচু কেল্লা থেকে সমতল প্রাঙ্গণে। অতঃপর বীর বিক্রমে সজোরে কয়েকটি আঘাত করে বসলেন ইহুদীর মাথায়। ইহুদী বিষয়টির আদি-অন্ত বুঝে ওঠার আগেই ধরাশায়ী- কুপোকাত! বীরাঙ্গনা ফিরে এলেন কেল্লায়। শত্রুকে একমুঠো লাল-শাস্তি উপহার দিয়ে। [নিসাউন হাওলার রাসূল : ১৮৮ পৃ.]

এইতো মুসলিম নারীর রূপ। ঘরে-বাইরে, কর্মে-চিন্তায়, বিজয়ে-আনন্দে সকল কল্যাণক্ষেত্রেই সে থাকে পুরুষের পাশে। পুরুষ অস্ত্র লয়ে রণাঙ্গনে যায়, নারী হৃদয়ভরে দেয় অসীম বিপ্লবে, বিজয়ের স্বপ্নে– কখনো বা সে নিজেই অবতীর্ণ হয় আল্লাহর রাহের জিহাদে। অতঃপর বীরাঙ্গনা ফিরে আসে প্রভুত কল্যাণের ধনে আঁচল ভরে ॥

ইসলামের প্রথম শহীদ : জননী সুমাইয়্যা (রা.)

হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন : প্রিয় নবীজীর ডাকে সর্বপ্রথম যাঁরা সাড়া দেন, পাশে এসে দাঁড়ান, জীবন-মরণ সঁপে দেন পবিত্র ইসলামের তরে তাঁদেরই অন্যতম হযরত আবু বকর, হযরত বেলাল, হযরত খাব্বাব, হযরত সুহাইব, হযরত আম্মার ও হযরত সুমাইয়্যা (রা.)! সে ছিল এক ভয়ঙ্কর পরীক্ষাকাল।

ভাগ্যবানদের ইসলাম গ্রহণের এক একটি সংবাদ বিষাক্ত তীর হয়ে বিদ্ধ হতো বেঈমান আবু জেহেলদের অন্ধ আত্মায়। তারা ক্ষুব্ধ হতো। হিংস্রতায় ফেটে পড়তো তারা। সেই ক্ষোভ ক্রোধ ও হিংস্রতা এক সময় চরম পাশবিক জঘণ্যতার রূপ নিল। তারা জোর করে ইসলামকে প্রতিহত করবে ভাবল। সত্যের যে প্রদীপ জ্বেলেছেন স্বয়ং প্রভু তারা সেই প্রদীপ নিভিয়ে দিতে চাইল।

মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন বেশ শক্তিশালী। বংশের শক্তি, বিত্তের বল সবই ছিল তাদের। যেমন হযরত আবু বকর (রা.)! কিন্তু অনেকেই ছিলেন এমন যাদের কোন শক্তি ছিল না। বংশেরও না, বিত্তেরও না! হযরত বেলাল, হযরত সুহাইব, হযরত আম্মার, হযরত ইয়াসির ও হযরত সুমাইয়্যা [রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুম] তাঁদেরই মধ্যে।

হযরত আম্মার (রা.)-এর মা হযরত সুমাইয়্যা! বাবা হযরত ইয়াসির! বাবা হযরত ইয়াসির (রা.) ছিলেন মূলত কাহ্‌তানের অধিবাসী। হারানো ভাইয়ের সন্ধানে এসেছিলেন মক্কায়। তারপর থেকে যান এখানেই স্থায়ীভাবে। চুক্তি ও সন্ধিবদ্ধ হন মক্কার আবু হুযাইফার সাথে। অবশেষে আবু হুযাইফার দাসী সুমাইয়্যাকে বিয়ে করেন। এ ছিল ইসলামপূর্ব ঘটনা। অতঃপর এ যুগল থেকেই জন্ম নেন হযরত আম্মার (রা.)। তাই মক্কায়

আম্মার পরিবারের কোন শক্ত খুঁটি ছিল না। আর খুঁটি ছিল না বলেই মক্কার কাফেরদের রক্তচক্ষুর প্রধান টার্গেট ছিল এই আম্মার পরিবার।

নির্যাতনের তাপিত প্রান্তরে ছিল হযরত সুমাইয়্যা ইয়াসির ও আম্মারের বাস। প্রচণ্ড গরমকালে মক্কার বালুকাময় প্রান্তরের প্রতিটি বালুকণা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দাউ দাউ করতো। তার উপর দিয়ে ভর দুপুরে কেউ হেঁটে যাওয়ার সাহস করতো না। পায়ে ফুসকা পড়ে যেত। তাপিত এই জ্বলন্ত বালুর উপর তাদেরকে শুইয়ে রাখা হতো। অবাধ্য জানোয়ারকে যেভাবে পেটাই করা হয় সেভাবে পেটাই করা হতো তাঁদেরকে। তাদের একটাই অন্যায়। তারা মুসলমান। হাতের তৈরি পাথরের মূর্তিগুলোকে এখন আর খোদা মানে না। তারা খোদা মানে খোদাকেই। প্রহারে প্রহারে বেহুঁশ করে ফেলা হতো তাঁদেরকে।

কখনো বা শাস্তির ধরণ বদল করতো তারা। গরম পানির মধ্যে চেপে ধরতো। মাঝে মধ্যে জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখতো। শরীরের চর্বিগুলো গলে গলে পানি হয়ে পড়তো। আর তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাকতো কেবলই আল্লাহকে। কারণ, এক আল্লাহ ছাড়া তাঁদের আর কোন সহায় ছিল না।

তাছাড়া হযরত সুমাইয়্যা আর হযরত ইয়াসির ছিলেন বয়সের ভারে দুর্বল। গায়ে শক্তি নেই। তবে হৃদয়ে বিশ্বাসের বল ছিল। আর সে বলেই লড়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা সময়ের সেরা ফেরাউনদের বিরুদ্ধে। প্রচণ্ড নির্যাতন আর দাবানলের ভেতরে থেকেও কেবল 'আহাদ- আহাদ' শ্লোগানে জাগিয়ে রাখতেন বিশ্বাসের প্রতিটি রক্তকণাকে।

মাঝে মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের পাশ দিয়ে যেতেন। দেখতেন জ্বলন্ত অঙ্গারে পোড়ে মরছে আল্লাহর সৈনিকেরা। বুড়ো মা-বাবার সঙ্গে কচি আম্মারও। নবীজী কখনো বা আম্মারের মাথায় হাত রেখে বলতেন :

يَا نَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى عَمَّارٍ كَمَا كُنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

"হে আগুন! ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে যেমন শান্তিদায়ক শীতল হয়ে গিয়েছিলে আম্মারের জন্যেও তেমনি হয়ে যাও!"

হযরত সুমাইয়্যা ও হযরত ইয়াসিরকে যখন নির্যাতিত হতে দেখতেন তখন বলতেন : ইয়াসির পরিবার ধৈর্য ধর! কখনো বা বেদনার ভার সইতে না পেরে প্রিয়তম প্রভুর দরবারে এই বলে প্রার্থনা করতেন : হে আল্লাহ! তুমি ইয়াসিরের পরিবারকে ক্ষমা কর! কখনো বা বলতেন : ইয়াসির পরিবার! সুসংবাদ শোন, বেহেশত তোমাদের অপেক্ষায় অধীর!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আর কী-ই বা করার ছিল। তাঁর ডাকে সারা দিয়ে তাঁরই চোখের সামনে কোন অন্যায় ব্যতীত এভাবে নির্যাতিত হচ্ছে এঁরা। তাও সুমাইয়্যার মত একজন কৃতদাসী। এত নির্যাতন এত শাস্তি ও এত অত্যাচারের পরও সত্যের পথে অবিচল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি পরম বিশ্বাস ও ভালোবাসায় নমিত-নিবেদিত। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে যেমনটি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)!

কুরাইশদের নির্মমতা মাঝে মধ্যে সীমা ছাড়িয়ে যেত। তখন আর তারা মানুষ থাকতো না। বন্য হায়েনাদেরকেও হার মানাতো তারা। তখন এই অসহায় দুর্বল নিরপরাধ মানুষগুলোকে লোহার পোশাক পরিয়ে জ্বলন্ত বালুর উপর দাঁড় করিয়ে রাখতো। মাথার উপর থেকে আকাশ ভারি বর্ষার মতো তাপ ঢালতো, বাতাস বয়ে আনতো ক্ষিপ্ত লেলিহান আর পায়ের তলার তপ্ত বালুরাশি তুষের আগুনের মত সেদ্ধ করে তুলত দুটো পা! অসহায় সুমাইয়্যা, অসহায় ইয়াসির আর অসহায় আম্মার দগ্ধ হতে থাকতেন সে ভয়ঙ্কর অগ্নিজ্বালায়। ঈমানের সে অগ্নিপরীক্ষা ভাষাতীত বর্ণনাতীত।

একদিনের ঘটনা। ভয়ঙ্কর জাহান্নামে দগ্ধ হচ্ছেন হযরত সুমাইয়্যা (রা.)! তার সামনে দিয়েই যাচ্ছিল বেঈমান আবু জেহেল। হযরত সুমাইয়্যা (রা.)কে দেখে তার ভেতরটা জ্বলে ওঠল। জ্বলে ওঠল নিজেদের পরাজয়ের কথা ভেবে। শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে যেন ধিক্কার বাণে জর্জরিত হচ্ছিল আবু জেহেল। ভাবছিল, ওরা দুর্বল! কৃতদাস ওরা! আর এই সুমাইয়্যা! একজন অসহায় বুড়ি। অথচ কত শাস্তি দিলাম! কিন্তু একটুও নরম হলো না। মাথা নোয়াবার কোন লক্ষণ নেই। এত অত্যাচারের ভেতরও সেই 'আহাদ আহাদ' রব। 'এক আল্লাহ এক আল্লাহ' শ্লোগান!

আবু জেহেল আর ঠিক থাকতে পারল না। পাপের হাওয়া তার ভেতরে মহা তুফান সৃষ্টি করল। হাতে ছিল একটি বিষাক্ত বর্শা। ছুঁড়ে মারল হযরত সুমাইয়্যা (রা.)-এর লজ্জাস্থানে! ভাগ্যবতী মহান বেহেশতী নারী নীরবে

ঘুমিয়ে পড়লেন শাহাদাতের শরাব পিয়ে। ইসলামের চির সবুজ শান্তিবৃক্ষ সিক্ত হলো সর্বপ্রথম এই জান্নাতী নারীর পবিত্র লহুতে।

পৃথিবীর সমগ্র নারী জাতির জন্যে এ এক বিস্ময়কর গৌরব। খোদার দীনকে যিন্দা করার জন্যে রক্ত দিয়েছেন তো অনেক ভাগ্যবানই। নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয়তম চাচা হযরত হামযা, হযরত হানযালা, হযরত সাদ, আবদুল্লাহ ইবন জাহ্‌শ, হযরত খুযাইমা (রা.) থেকে শুরু করে কত ভাগ্যবানই জীবন দিয়েছেন আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার খাতিরে। দিচ্ছেন আজো আফগান, কাশ্মীর ইরাকসহ পৃথিবার বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু সর্বপ্রথম খোদার রাহে জীবন বিলাবার গৌরব সে হযরত সুমাইয়্যা (রা.)-এর, তিনি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ।

অবশ্য হযরত ইয়াসির (রা.) ইতোপূর্বেই মক্কার বেঈমানদের নির্যাতনে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বেঁচে থাকেন হৃদয়ের ধন আম্মার (রা.)!

তারও অনেক পরে যখন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত করেন তখন তাঁরা ঘুরে দাঁড়ান। ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করার অবিনাশী প্রেরণায় উজ্জীবিত নবীর সঙ্গীগণ জ্বলে ওঠেন ঈমানের বজ্রহিম্মতে। রুখে দাঁড়ান আঁধারচারী সন্ত্রাসী বেঈমানদের বিরুদ্ধে। সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ। সত্য-মিথ্যা আলাদা হয়ে ওঠার যুদ্ধ। আল্লাহর সৈনিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়েন রণাঙ্গনে– সত্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে। আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করেন মুসলমানদেরকে। এমনকি মক্কার সবচে' বড় বোয়াল আবু জেহেলটাও মারা যায় এই যুদ্ধে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পাশে তখন আম্মার। বীর জননীর বীরপুত্র আম্মার। সামনে দুর্ভাগা আবু জেহেলের লাশ। অসহায় বৃদ্ধা শহীদ জননীর রক্তমাখা বদনখানি যেন স্বরূপে ভেসে ওঠল আম্মারের সামনে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সান্ত্বনার সুরে বললেন قتل الله قاتل امك "আল্লাহ তোমার মায়ের হত্যাকারীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।" [সূত্র : সীরাতুল মুসতাফা- ১ : ২২৫–২২৭ পৃ.]

হযরত খানসা (রা.) : চার শহীদের মা

হযরত খানসা 'রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা' ইসলামী ইতিহাসের এক চির জীবন্ত নাম। মুসলিম উম্মাহর চেতনার দীপ্ত মশাল হযরত খানসা (রা.)। জীবন সায়াহ্নে যাঁর জ্বলেছিল ইসলামের আলো। অতঃপর বার্ধক্যের সকল বাধা পয়মাল করে স্বীয় গোত্রের আরো ক'জন ভাগ্যবানকে সঙ্গে করে হাজির হন এসে পবিত্র মদীনায়– প্রিয় নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোকিত প্রাঙ্গণে। অতঃপর আলোর দরিয়ায় অবগাহন করে স্বীয় হৃদয় চিন্তা অনুভব সবকিছুকে সাজিয়ে তুলেন অপূর্ব আলোক বিভায়– শাশ্বত ইলাহী নূরে।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের বৈঠকটিও ছিল খুবই চমৎকার। তিনি ছিলেন আরবদের খ্যাতিমান বরেণ্য কবিদের অন্যতম। বিশেষ করে শোকগাথা রচনায় ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বি কবি। আরবদের সুবিখ্যাত ওক্কায মেলায় যখন কবিদেরকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের হাট বসতো তখন সেখানে হযরত খানসার জন্যেও একটি তাঁবু খাটানো হতো। অধিকন্তু তাঁর সম্মানে তাঁর তাঁবুর সমুখে একটি পতাকা টানানো থাকতো। আর সেই পতাকায় লেখা থাকতো : 'সর্বশ্রেষ্ঠ আরব শোককবি।' সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবি, আরবী সাহিত্যের কিংবদন্তী পুরুষ 'নাবিগা' তাঁর কবিতা শোনে বলেছিলেন : আমি যদি আবু উবাইদা [আ'শা]-এর কবিতা পূর্বে না শোনতাম তাহলে বলতাম : খানসা সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচে' বড় কবি।

ইসলাম গ্রহণ করতে যখন হযরত খানসা (রা.) নবীজীর খেদমতে হাজির হন তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দীর্ঘক্ষণ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও গভীর মনযোগসহ দীর্ঘক্ষণ শোনেন তাঁর কবিতা এবং বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকেন।

কিন্তু এই কবি জননী যে বুকের ভেতর বহন করে চলতেন এক প্রতাপতেজী অগ্নিরূপ সে কথা জানা ছিল না অনেকেরই। অবশেষে সে রূপই চরম বিদ্রোহী হয়ে বিকশিত হলো হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে।

ইরাক থেকে ডাক এলো যুদ্ধের। আল্লাহর পথে জিহাদের পয়গাম এলো মদীনায়। আল্লাহর দীনের জন্যে জীবনদানের আহ্বান এলো আল্লাহপ্রেমের আলোকিত শহরে। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সংবাদ পেলেন হযরত খানসা (রা.)। কলজে-ছেঁড়া ধন চার পুত্রকে নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন রণাঙ্গনে। এবং রণক্ষেত্রে গিয়ে হৃদয়ের ধনদেরকে একত্রিত করে বললেন :

'আমার প্রিয় পুত্রগণ! তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছো। এবং নিজ মর্জিতেই নির্বাসন বরণ করেছো। অন্যথায় তোমরা তোমাদের দেশে বোঝা ছিলে না। তোমরা দুর্ভিক্ষেও পড়নি। তাছাড়া তোমাদের এক বৃদ্ধা জননীকে এক রক্তলাল রণাঙ্গনে এনে হাজির করেছো। যোদ্ধা রক্তপিয়াসী অশ্বারোহীদের সামনে এনে ছেড়ে দিয়েছো।

আল্লাহর কসম! তোমরা এক মাতা এবং পিতার সন্তান। আমি তোমাদের বাবার সাথেও কখনো অসৎ ব্যবহার করিনি। তোমাদের মামারাও কখনো আমার কারণে অপমানিত হননি। আর তোমরা সকলেই জানো, এই পৃথিবীটা নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। আর আল্লাহর পথে জিহাদ করা এক উত্তম ইবাদত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِصْبِرُوْا صَابِرُوا وَرَابِطُوْا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহর পথে লড়াই কর।"

সুতরাং তোমরা কাল প্রত্যুষে ওঠেই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদ করে যাবে।

বীরাঙ্গনা জননীর কথায় একবাক্যে প্রস্তুত বীর সন্তানরাও। প্রত্যুষে উঠে সকলেই প্রস্তুত খোদার রাহে জীবন বিলাতে। অতঃপর ধীরপদে শান্তচিত্তে চিরন্তন সফলতার মনযিল পানে এগিয়ে যান খোদার রাহে! চার সিংহ-সন্তান ঝাঁপিয়ে পড়েন যুদ্ধের ময়দানে। অতঃপর সমর-কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ঢুকে পড়েন শত্রুর ঝড়ের মধ্যে এবং শাহাদাতের শরাব পানে তৃপ্ত করেন মায়ের হৃদয়। শহীদ জননী বীরাঙ্গনা 'মা' চার দুলালের শাহাদাতের সংবাদ শোনে গভীর শোকর আদায় করেন মহান আল্লাহর দরবারে।

এই তো সফল জননীর রূপ– বুকের অমূল্য মানিকদেরকে যিনি বিলিয়ে দিতে পেরেছেন মহান মালিকের প্রিয়পথে। বিনিময়ে তাঁরাও প্রিয় হয়েছেন মহান আল্লাহর আর খানসা (রা.) হয়েছেন চার শহীদের গর্বিতা জননী– কিয়ামত পর্যন্ত সকল আদর্শ আল্লাহপ্রেমিক জননীদের পথ চলার আলো। [মাওলানা সাঈদ আনসারী কৃত হায়াতুস-সাহাবিয়্যাত]

নারীদের নবীপ্রেম : কয়েকটি উপমা

নারী প্রেমময়ী, নারী প্রেমের আকর। জগতে হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, প্রেম ও মমতা প্রতিষ্ঠায় নারীর কৃতিত্ব অবিনাশী। এই মাটির পৃথিবী তাই ধরে নিয়েছে, নারীই প্রেমের জীবন। কথিত আছে, নারী যখন কাউকে ভালোবাসে তখন হৃদয়ের গভীরতায় ঢুকেই তাকে ভালবাসে। হৃদয়ে সঞ্চিত তপ্ত খুনে জ্বালিয়ে রাখে প্রেমের প্রদীপ। পার্থিব এই ছোট দুনিয়ার সকল কিছুই তখন তার কাছে হয়ে পড়ে একেবারে মূল্যহীন! প্রেম ও ভালোবাসার এই প্রাণময় ভুবনে নারীর ত্যাগের স্বাক্ষর জগৎব্যাপী। পৃথিবীর সকল সভ্য-বিদ্বান সমাজ-ই তা জানে, প্রত্যক্ষ করে প্রতিনিয়ত প্রেমের দিগন্তে নতুন সৃষ্টি, নতুন উপমা!

পার্থিব এই দু'দিনের প্রান্থশালায় নারী যেভাবে প্রেম নিবেদন করেছে যুগে যুগে স্থুল সম্পদ, বৈভব, বিত্ত, রূপ-সৌকর্য আর শরীরের টানে তেমনি এই নারীই আবার হৃদয় মন শক্তি সঞ্চয় সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছে সত্য সুন্দর আদর্শ ও ধর্মের স্বার্থে। আলোকময়তা ও পবিত্রতায় নেচে ওঠেছে মহিয়সী নারীরূপ, সেই রূপ আজো আলোকিত করে রেখেছে মানব ও মানবতার বিশাল অতীত। সেই বিশাল অতীতের পথে পথে আজো যাদের প্রেমময় জীবন-সুন্দর আলোকময় বাতিঘরের মতো পথ দেখায় বিশ্বময় সকল সত্য সন্ধানীকে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি মহিলা সাহাবীদের অনুপম ভালোবাসা তার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র সত্তা তাঁদের কাছে নিজেদের জীবনের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুখ, নিরাপত্তা ও হেফাযতের তরে তাঁরা নিজেদের এবং নিজেদের কলজে ছেড়া ধন হৃদয়ের টুকরা সন্তানদেরকেও উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না! প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জড়িত যে কোন স্মৃতি চিহ্নকে আমরণ বুকে ধরে রাখতেন তারা কাতর প্রেমিকের মত। উপমারহিত আভাদীপ্ত সেই বেমিছাল প্রেম ও ভালোবাসার কয়েকটি উপমা তুলে ধরছি এখানে। আজকের নবী প্রেমিক মুসলিম নারীদের জন্যে। অবশ্য এসব ঘটনা নারী-পুরুষ সকলের তরেই সমানভাবে ঈমানবর্ধক, চেতনার মৃত সাগরে জাগরণের অগ্নি সৃষ্টিকারী!

হযরত উম্মে সুলাইম (রা.)

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঘরে পা রাখতেন আকাশ-পৃথিবী তার প্রতি ঈর্ষা করতো। তাই মাঝে মধ্যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সাহাবী ও সাহাবিয়্যার ঘরে গমন করতেন। বিশ্রাম করতেন। তাঁরা তখন যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেতেন। আনন্দের বন্যা বয়ে যেত তাদের ঘরময়-হৃদয়ময়।

হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) ছিলেন প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অনুরক্তদের অন্যতম একজন। প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত প্রবল ও পক্ক ছিল, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে দুপুরে কখনো বিশ্রামে গেলে গরমের প্রচণ্ডতায় যখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নূরানী বদন থেকে মুক্তার দানার মত শ্বেদবিন্দু ঝরে পড়তো উম্মে সুলাইম তখন ওই সুবাসিত গন্ধমদীর ঘর্মবিন্দুগুলো সযতনে তুলে রাখতেন শিশিতে। সন্তর্পনে সংরক্ষণ করতেন ভেঙ্গে পড়া চুলগুলো পর্যন্ত। অমূল্য এই সঞ্চয়ের কাছে আকাশ বাতাস, সোনা-দানা কি ছাই!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃষ্ণার্ত। ডাকলেন উম্মে সুলাইমকে!

: উম্মে সুলাইম, পানি দাও!

উম্মে সুলাইম (রা.) মশক থেকে পানি ঢালতে শুরু করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধা দিয়ে বললেন : ঢালতে হবে না। পুরো মশকটাই আমার কাছে দাও! মশক তুলে দিলেন নবীজীর খেদমতে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ রেখে পানি পান করলেন। হুযূর চলে যাবার পর উম্মে সুলাইম করলেন কি, মশকের মুখটি কেটে নিজের কাছে রেখে দিলেন। প্রিয়তম নবীর পবিত্র মুখের স্পর্শে ধন্য এই অমর স্মৃতি কি অন্য কারো ব্যবহারে দেয়া যায়? তাছাড়া এই এক খণ্ড স্মৃতিই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ!

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস (রা.) এই উম্মে সুলাইমেরই হৃদয়ের দুলাল। হযরত আনাসের মাথার চুলগুলো বেশ বড় হয়ে পড়েছে। ভাবছিলেন কেটে ফেলবেন। মাকে জানালেন সেই ইচ্ছের কথা! মা মমতাভরা কণ্ঠে বললেন : 'না বাবা! চুলগুলো কেটো না। কারণ, তোমার এই চুলগুলো প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে ধরেছেন, স্পর্শ করেছেন।' প্রিয়তমের ছোঁয়াধন্য স্মৃতির কর্তন সংবাদ যেন তার ভিতরটাকে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মত কাঁপিয়ে তুলেছে। আহা, কত গভীর সেই মমতা!

জীবনের শেষ সময় যখন উপস্থিত তখন তিনি একটি অসিয়তপত্র লেখালেন। তাতে এও লেখালেন— প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুরভিত যে ঘামের বিন্দুগুলো আমি শিশির মধ্যে সংরক্ষণ করে রেখেছি, আমার কাফনের সাথে ওই শিশিটি রেখে দিও, আমার সমাধি মাঝে।

শুধু নিবাসেই নয়। উম্মে সুলাইমের ভালোবাসা ছিল জীবনব্যাপী! হযরত আবু তালহা (রা.) বর্ণনা করেন : হুনাইনের যুদ্ধের সময় দেখি কি উম্মে সুলাইমের হাতে একটি খঞ্জর। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানালাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেকে বললেন তুমি এটি দিয়ে কি করবে? উম্মে সুলাইম বললেন : 'কোন বেঈমান মুশরিককে নাগালে পেলে তার পেটে চালান করে দেব!'

এই তো প্রেম! শুধু সত্তা পর্যন্তই যা বন্দী নয়। বরং আদর্শ পর্যন্ত ব্যাপ্ত এবং সেই আদর্শের জন্যে জীবন বিলাতে কুণ্ঠিত নয় যে সেই তো সত্য প্রেমিক!

হযরত ফাতিমা বিনতে উতবা (রা.)

প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে রেখেছেন তাঁর জানবাজ সঙ্গীরা! কত মুবারক সেই দৃশ্য! এই মুবারক মাহফিলেই হাজির হলেন ফাতিমা বিনতে উতবা (রা.)! এসে বিনয়ের সাথে আরয করলেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটা সময় ছিল যখন আমি কামনা করতাম দুনিয়ার মধ্যে যদি কেবল আপনার ঘরটাই ধ্বংস হয়ে যেত– আর সবই থাকতো ঠিকঠাক। আর আজ আপনার প্রতি আমার ভালবাসা এমন– আমার মন বলে এই পৃথিবীতে আর কারও ঠিকানা থাকুক আর নাই থাকুক আপনারটা থাকুক!

একথা শোনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন : দেখ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে তোমার নিজের চাইতেও অধিক মহব্বত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুসলমানই হতে পারবে না।' ফাতিমা আরয করলেন : হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আমার কাছে আমার জীবনের চাইতেও অধিক প্রিয়!

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)

নবীজীর প্রতি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর ভালোবাসার কথা সুবিদিত। তাঁরই পুণ্যবতী কন্যা হযরত আসমা (রা.)। নবীজীর প্রতি তার ভালবাসা ছিল অসীম। ছোট বোন আইশা (রা.)-এর সুবাদে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি জামা পেয়েছিলেন। আর সেকি কদর এই জামার। যত্নভরে সংরক্ষণ করতেন। ঘরের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই জামাটি ধুয়ে তার পানিটা রোগীকে পান করিয়ে দিতেন। আর পবিত্র ভালোবাসার বরকতে রোগী সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে ওঠতো! নবীজীর বদনের পরশ মাখা জামা! সহজ কথা!!

নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্মৃতি জড়িত এই জামাটি হযরত আসমা (রা.) যখনই দেখতেন দু'চোখ থেকে তার দরদরিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকতো! নবীজীর বরকতময় কাল, সোনাঝরা দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠতো; নবীজীকে হারাবার কষ্টগুলো বৈশাখ মাসের ঝড়ের মত ভেতরটাকে শক্তভাবে ঝাকুনি দিতো! এই তো সত্যিকারের নবীপ্রেম– যে প্রেম বিনে কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে না!

হযরত ফাতিমাতুয-যাহরা (রা.)

প্রিয় নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয়তমা দুলালী! হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন ভালোবাসতেন হযরত ফাতিমাকে তেমনি হযরত ফাতিমা (রা.)ও ভালোবাসতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে। সে ভালোবাসার স্বরূপ স্পর্শ করা মানুষের পক্ষে অসাধ্যই বটে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসার অর্থ কি? সে কি হৃদয়কাড়া কিছু শব্দ বিনিময় না কিছু অনুভূতি তাড়িত সাময়িক ভাব নিবেদন? এর উত্তর দিয়েছেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! তিনি যেভাবে একথা বলেছেন : তোমাদের একজনেও পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার মা-বাবা সন্তান-সন্ততি আর সহায়-সম্পদের চাইতে অধিক প্রিয় বলে বিবেচিত না হই! সেই সাথে এও বলছেন : তোমাদের কেউ-ই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মন ও কামনা আমি যে আদর্শ (ইসলাম) নিয়ে এসেছি তার পরিপূর্ণ অনুগত না হবে। অতএব, বক্তব্যের খোলাসা এটাই দাঁড়ায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসার মর্মই হলো, তাঁর দেয়া জীবন-বিশ্বাসের অনুসরণ করা! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : '(হে রাসূল) আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর।' অর্থাৎ রাসূলকে অনুসরণ করার মানেই আল্লাহকে ভালোবাসা!

এই আনুগত্যের ফসলও বিস্ময়কর, অনুপম, অসীম ও ভাষাতীত। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে আমাকে ভালোবাসবে সে বেহেশতেও আমার সঙ্গী হবে। প্রিয় নবীজীর প্রিয় দুলালী হযরত ফাতিমা (রা.)ও ছিলেন নবীর প্রেমের আনিন্দ্য উপমা, নন্দিত রূপ।

এক দিনের ঘটনা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন দুহিতা ফাতিমার ঘরে। এসে দেখেন ফাতিমার হাতে স্বর্ণের চুড়ি। আর সে অন্য এক মহিলার সাথে বলছে : 'এগুলো হাসানের বাবা এনে দিয়েছে! উপহার স্বরূপ!' একথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ফাতিমা, মানুষ যদি বলে– নবীর মেয়ের হাতে জাহান্নামের চুড়ি, তাহলে তুমি খুশী হবে?' একথা বলেই তিনি চলে গেলেন। হযরত ফাতিমা (রা.)ও সঙ্গে সঙ্গে চুড়িগুলো বিক্রি করে সেই অর্থে একটি গোলাম খরিদ করে আযাদ করে দিলেন। এ সংবাদ শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করলেন : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ'র যিনি ফাতিমাকে আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ওফাতে সর্বাধিক ব্যথা পান হযরত ফাতিমা (রা.)! বিষাধ-বিধুর কণ্ঠে বার বার আবৃত্তি করেন–

'সুব্বাত আলাইয়া মাসাইবুন

বিষাদের যে আঘাতে আক্রান্ত আমি আজ

তা যদি গ্রাস করতো কোন দিবসকে,

সে দিবস রূপান্তরিত হতো নিশিতে।'

অথচ এই ফাতিমা (রা.) যখন সংসারের সব কাজ নিজ হাতে করতে করতে অবসন্ন আর পানির মশক টানতে টানতে হাতে ও পিঠে শক্ত দাগ বসে পড়েছে তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে যুদ্ধ থেকে অনেক গোলাম-বাদী এসেছে শোনে গেলেন আইশা (রা.)-এর খেদমতে। কষ্টের সংবাদ শোনে সরাসরি ঘরে চলে এলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! এসে আলী ও ফাতিমাকে ডেকে বললেন– প্রতিদিন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে– এটাই ওসব দাস-দাসীর চাইতে অনেক অনেক উত্তম!

আসলে তো তাই! মুমিনের দৃষ্টিতো থাকবে আখেরাতের দিকে! পরকালীন বিজয় সফলতা নাজাত ও মুক্তিই হবে তার স্বপ্নের আরাধনা! আর সেই স্বপ্ন পূরণের সরল ও প্রত্যয়পূর্ণ পথই হলো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি নিখাদ ভালোবাসা! নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেখানো দীন, দীনী বিশ্বাস, ইসলামের জীবন ব্যাপী আলোকিত পথ-নির্দেশের পরিপূর্ণ অনুসরণই হলো যে ভালোবাসার মূল মর্ম!

পক্ষান্তরে জীবনের সকল প্রাঙ্গণ থেকে নবীজীর শিক্ষা আদর্শ ও জীবন দর্শনকে ঝেটিয়ে বিদায় করে অত:পর মুখে মুখে কিংবা নানা উপলক্ষ্যে কথিত 'মৌলুদ শরীফে'র শিরনি বিলিয়ে নিজেকে নবী প্রেমিক দাবী করা অনর্থক হঠকারিকতা, ভয়ংকর বিদ্রূপ আর অন্ধ বোকামী ছাড়াই কিছুই নয়।

আজ ইসলাম ও মুসলমানদের এই আঁধারঘন দুর্দিনে প্রয়োজন প্রিয় নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি যথার্থ প্রেম ও ভালোবাসা দীপ্ত জীবন গড়া এবং সেই আদলে নিজেদের সন্তানদেরকে গড়ে তোলা! এ ক্ষেত্রে মায়েদের দায়িত্ব দ্বিগুণ এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ!!

এক বীরাঙ্গনা জননীর কথা

নারী মানব ও মানব সভ্যতার অর্ধাংশ। তাই সভ্যতার বিকাশ ও নির্মাণে মানবগোষ্ঠীর পদচারণা ঘটেছে যত অঙ্গনে, নারী তার সঙ্গী অংশীদার ও ভাগীদার হয়েছে সদাসন্তর্পণে। পুরুষ সংসার পেতেছে, নারী দিয়েছে তাতে সার্বক্ষণিক শ্রম। পুরুষ সমাজ গড়েছে নারী দিয়েছে তাতে হৃদ্যতার প্রাণ, পুরুষ শাসন করেছে দেশ, নারী শাসন করেছে পুরুষের হৃদয়রাজ্য। পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, শাসন, সভ্যতা, প্রেম, যুদ্ধ সকল ক্ষেত্রেই নারীর অবদান অসামান্য, সূর্যের আলোর মত দীপ্যমান।

অপরাধীরা অপরাধ চর্চার পথ মুক্ত করতে যখনই সভ্যজনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সমাজের বীর পুরুষরা মহাপরাক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, তখন নারীরাও ঘরে বসে থাকেনি। মানবতা, সভ্যতা ও সত্যের প্রতি অসীম প্রেম, বিশ্বাস, অনুরাগ নিয়ে তারাও এগিয়ে এসেছেন বীরাঙ্গনার বেশে। কখনো বা বীর-বীর্যে অবতীর্ণ হয়েছেন সরাসরি লড়াই-এর ময়দানে। কখনো বা নিজের কলজে-ছেঁড়া ধন আদরের দুলালদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন আল্লাহ'র পথে, আল্লাহর দীন ও নাম প্রতিষ্ঠিত করার মহান মানসে। ইতিহাস তাদের নাম বুকে ধারণ করতে পেরে আজো গর্বিত। তারা মানব সভ্যতার অহংকার।

বিশ্বময় নারী জাতির অহংকারের ধন সেইসব মহিয়ষী সুবাসিনী বিপ্লবী জননীদের অন্যতম হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)। সায়্যিদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) তাঁর-ই নাড়ীছেঁড়া ধন।

ইতিহাসবিখ্যাত জালিমশাহী হাজ্জাজ যখন পবিত্র মক্কা নগর আক্রমণ করে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) তখন কা'বার হেরেমে আশ্রিত। হাজ্জাজ তার বাহিনী নিয়ে চারদিক থেকে হেরেম শরীফকে ঘিরে রেখেছে। অতঃপর প্রস্তর নিক্ষেপ ও গোলাবর্ষণে কম্পিত করে তুলেছে কাবার সুশান্ত

পবিত্র অঙ্গন। উম্মাহর বীর সন্তান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও তাঁর অপর বিপ্লবী সঙ্গীরা প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছেন কা'বার প্রভুর পক্ষে, সত্যের পক্ষে। দিনের পর দিন চলছে দুই অসম শক্তির লড়াই। অবশেষে ত্রাসিত অবরুদ্ধ কা'বাবাসীদের সামানপত্র ফুরিয়ে আসে। যোদ্ধাগণ যুদ্ধের ঘোড়া জবাই করে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু মক্কা নগর কেঁপে ওঠে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ জ্বালায়। আর বীর সন্তানেরা একের পর এক দিতে থাকে তাজা জীবনের নাজরানা। ক্রমে ভরে উঠতে থাকে শহীদানের ঈদগাহ। অসহায় ক্ষুধার্ত নারী শিশু ও বৃদ্ধদের আহাজারী ভারি করে তুলে বেদনার আকাশ। অপারগ নিরুপায় যন্ত্রণাকাতর অনেক সঙ্গী নিভৃতে চলে যেতে শুরু করে যুদ্ধের শিবির ছেড়ে। সে অবস্থা বড়ই বাকরুদ্ধকর।

অবশেষে ভয়ংকর এই পরিস্থিতিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) হাজির হলেন গিয়ে জননী আসমার খেদমতে। আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকরের কন্যা আসমা (রা.)। বু'বকরী চেতনা, প্রতাপতেজী বিশ্বাস ও দৃঢ়তা ঢেউ তুলে খেলা করে তাঁর রক্তের স্রোতে। ধমনীতে তাঁর আপোসহীনতার মহাউত্তাপ। বেটা এসেছে তাঁর-ই কাছে পরামর্শ চাইতে; শহীদী ঈদগাহের ইমাম এসেছে যোদ্ধা প্রসবিনী জননীর কাছে একটি পদ্মলাল সিদ্ধান্ত নিতে। দেখি জননী কি বলেন।

মাগো! আমার সকল সঙ্গী এমনকি আমার সন্তানরাও আমার সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে। অফাদার-দৃঢ়সংকল্প কিছু আল্লাহ'র বান্দা ছাড়া আমার সঙ্গে আর কেউ নেই। তারাও এখন প্রতিরোধ করতে অক্ষম। অথচ শত্রুপক্ষও আমাদের দাবী মেনে নিচ্ছে না। এখন আমি কি করব?

বেটা! তুমি যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, তাহলে সেই সত্যের জন্যে যাও, জীবন দিয়ে দাও! যেভাবে তোমার শহীদ বন্ধুরা জীবন দিয়েছে। আর যদি তুমি সত্যের উপর না হও, তাহলে তোমার আগেই ভাবা দরকার ছিল; তুমি কত মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়েছ।

: মা প্রতিরোধ যে করব, সঙ্গীরাতো নেই!

বেটা! শরীফ সম্ভ্রান্ত কোন ঈমানদারের জন্যে এটা অজুহাত হতে পারে না! একবার ভেবে দেখ, তুমি এই পৃথিবীতে কতদিন থাকবে। সত্য পশ্চাতে ফেলে বেঁচে থাকার চাইতে সত্যের জন্য জীবনদান অনেক শ্রেয়। হাজার শ্রেয়!

মাগো! আমার আশংকা হচ্ছে, বনূ উমাইয়ার লোকেরা আমাকে শূলে চড়াবে; আমার লাশ বিকৃত করে ফেলবে, আমাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

বাবা! বকরী যখন যবাই করে ফেলা হয়, তখন চামড়া তুলে ফেলার ফলে তার কোন কষ্ট হয় না। সুতরাং যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও! নিজের দায়িত্ব আদায় কর।

শতবর্ষের জননীর ললাটে চুমু খেলেন সিংহ-শাবক ইবনে যুবাইর (রা.), আর বললেন, মাগো! আমি ভীরু নই! কাপুরুষ নই আমি। আমি চেয়েছিলাম তোমাকে শুধু এই সান্ত্বনাটুকু দিতে, তোমার ছেলে সত্যের জন্যে জীবন দিতে যাচ্ছে।

বাবা! আমি ধৈর্য ধরব! তোমার বিয়োগে আমি সবর করব। যদি বিজয় নিয়ে ফিরে আস খুশি হবো! এখন যাও! ত্যাগের পরীক্ষা দাও! ফলাফল আল্লাহর হাতে।

মা! আমার জন্যে একটু দু'আ করে দাও না!

: হে আল্লাহ! আমার বুকের ধনকে তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি। তাকে তুমি দৃঢ়তা দাও, আর আমাকে ধৈর্য ধরার তাওফীক দাও!

অতঃপর বৃদ্ধা জননী স্বীয় কম্পিত হস্তদ্বয় প্রসারিত করে মাতৃত্বের এক আকাশ মমতা মিশিয়ে ডাকলেন, বাবা! একটুখানি আমার কাছে আয়! আমি জীবনের শেষবারের মত তোকে একটু বুকে জড়িয়ে নিই!

মাগো তোমার সাথে এই বুঝি আমার জীবনের শেষ মোলাকাত!

নত মস্তকে এগিয়ে গেলেন। ললাটে চুমু খেলেন এবং বললেন, যাও বাবা! কর্তব্য পালন কর!

পুত্র তখন লৌহবর্মে সজ্জিত বীর মুজাহিদ! বৃদ্ধা-জননী পুত্রকে আদর করে শেষ বিদায় ক্ষণে লৌহসজ্জার কঠিন স্পর্শে চকিত হলেন। বিস্ময়ের সাথে বললেন, বেটা! এগুলো কি? যারা আল্লাহর পথে জীবন দিতে যায়, তাদের গায়ে লোহার পোশাক থাকে? সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলেন ইবনে যুবাইর লৌহবর্ম। অতঃপর ঢুকে পড়লেন শত্রুর ঝড়ের ভেতর। শহীদী ঈদগাহের ইমাম শান্ত হয়ে পড়লেন খানিক পরেই শাহাদাতের শরাব পানে।

আজ পৃথিবীর দিকে দিকে যখন শত্রু হায়েনাদের পাশবিক উন্মত্ততায় লণ্ডভণ্ড সকল মুসলিম জনপদ, তখন পৃথিবীর তাপসী জননীরা কি বীরাঙ্গনা শহীদ-জননী হযরত আসমার আদর্শে বলীয়ান করে তুলবেন না তাদের জীবন ও বিশ্বাসকে! তারাও কি হযরত আসমার মত স্বীয় সন্তানকে ঝাপটে ধরে বলবেন, বেটা! সম্মানজনক মৃত্যু অপমান ও গোলামীর জীবনের চাইতে হাজার গুণ শ্রেয়!!

ইসলামে নারী : কন্যা কামিনী জননী

পৃথিবীর সকল জাতি-ধর্ম, বিদ্যা-দর্শন নারীকে ছোট করেছে, মানহীন করেছে, সুলভ করেছে, পরিণত করেছে সস্তা বেসাতিতে। পক্ষান্তরে ইসলামই একমাত্র জীবনদর্শন, যা নারীকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে, ভিন্নমাত্রার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেছে, করেছে জীবন-সভ্যতার সমান ভাগীদার। বরং পতিত ভাগাড় থেকে তুলে এনে ইসলামই নারীকে বসিয়েছে মানবের আসনে; মান-মর্যাদায় করেছে মহান।

অথচ খুটিয়ে দেখলে সহজেই অনুমিত হয়, জীবন-সভ্যতার সমান ভাগীদার এই নারী শারীরিক বল-বীর্য, গঠন-সৌষ্ঠব, মানসিক কর্মক্ষমতা, মনন-চিন্তা, সৃজন ও আবিষ্কারে পুরুষের চাইতে দুর্বল। অথচ ইসলাম তাকে এমনভাবে উৎসাহিত করেছে, এমন দরদ ও আন্তরিকতার সাথে তাকে জীবন জলসায় এনে তুলে ধরেছে, যাতে সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে আমি দুর্বল, আমি হতবল কিংবা আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে সদা ভীরুতার চাপা সুর।

একজন নারী জীবনে তিনটি স্তর অতিক্রম করে। প্রথমত, সে শিশুকন্যা থেকে কৈশোর পর্যন্ত অতিক্রম করে বাল্যকাল- সখের দৌরাত্মপূর্ণ এক সবুজ জিন্দেগানী। দ্বিতীয়ত, তার যৌবনকাল। তৃতীয়ত, বার্ধক্য। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, এই তিনটি স্তরের প্রতিটিতেই নারী অন্যের ভরসায় প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত তার বাল্যকাল কাটে মা-বাবার সোহাগপূর্ণ ভরাট যত্নে। মা-বাবার এই মমতাময় ছায়ার নীচে তার জীবন কাটে স্বর্গীয় নিরাপত্তায়। অতঃপর যৌবনে উত্তীর্ণ হতেই 'স্বামী' নামের এক কর্তব্যনিষ্ঠ পুরুষ এসে কাঁধে তুলে নেয় তার সকল চাওয়া-পাওয়ার দায়িত্ব। অতঃপর বার্ধক্যের চৌকাঠে কদম দিতেই শত শ্রদ্ধা, মমতা ও হৃদ্যতার ডালি নিয়ে পদতলে উপস্থিত হয় আদরের দুলাল-দুলালীরা। ইসলাম নারীকে এভাবেই দেখেছে আদ্যোপান্ত। জীবনের পদে পদে তাকে সুহৃদ-সহকর্মী জোগান দিয়েছে ইসলাম।

নারী যখন শিশু কিংবা বালিকা, তখন তার সম্পর্কে ইসলাম বলেছে, প্রিয় নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষ্য– 'ছেলেরা তোমাদের জন্য আল্লাহর নেয়ামত। এর জন্যে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় কর।' পক্ষান্তরে কন্যাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন– 'এরা হলো তোমাদের জন্য পুণ্যমালা-নেকীসমূহ।'

অর্থাৎ ছেলেরা আল্লাহর নেয়ামত, যদি এদের কদর না কর তাহলে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু কন্যাদের সম্পর্কে বলেছেন, এরা সরাসরি তোমাদের জন্যে নেকী-পুণ্যমালা। নেকী যেভাবে মানুষকে বেহেশতে নিয়ে যায়, এই কন্যারাও তাদের পিতা-মাতাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। মূলত এভাবেই ইসলাম কন্যাদের প্রতি মা-বাবার দৃষ্টি, দরদ, আন্তরিকতা ও মমতাকে আকর্ষণ করেছে। উৎসাহিত করেছে তাদের মাধ্যমে নিজেদের পরকালকে ধনবান করে তুলতে।

অতঃপর কন্যা যখন বধূ হয়ে স্বামীর ঘরে যায় তখন ইসলাম বলেছে,

ان اكرم المؤمنين احسنكم اخلاقا و الطفكم اهلا

'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মান পাবার যোগ্য মুসলমান সে, যার চরিত্র ভাল এবং যে তার স্ত্রীর সাথে সদাচারী-কোমলপ্রাণ।'

অর্থাৎ উত্তম মুসলমান সে, যার চরিত্র উত্তম এবং পবিত্র। আর চরিত্র উত্তম তারই, যে তার স্ত্রীর সাথে প্রাণপূর্ণ, প্রেমভরা কোমল আচরণে অভ্যস্ত। তার স্খলনে, ভুল-ত্রুটিতে, রুদ্ররোষে ক্ষেপে ওঠে না তার বিরুদ্ধে। বরং মমতার শীতল পরশ তাকে ধৈর্য ধরতে বাধ্য করে।

তারপর রমণী যখন জননী হন, তখন তার প্রতি সন্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে অত্যন্ত কঠিনরূপে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত।' তাই মায়ের অনুগত্যে যতটা সচেষ্ট হবে, ততটাই বেহেশতের নিকটবর্তী হবে। আর অবাধ্য হবে যতখানি, বেহেশতের সুবাসিত প্রাঙ্গণ থেকে দূরে সরে পড়বে ঠিক ততখানিই। সেই সাথে ছিটকে পড়বে আল্লাহর রহমত থেকে। তাছাড়া বলার ভঙ্গিটাও কত কোমল। মানবদেহের সর্বাধিক স্বল্প মর্যাদাপূর্ণ বরং সবচেয়ে মানহীন অঙ্গ হচ্ছে পা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মায়ের এই সবচেয়ে কমমূল্যের অঙ্গ পায়ের তলায়ই তোমার বেহেশত।' সুতরাং এই মায়ের মূল্য যে কত, তা সহজেই অনুমেয়।

পক্ষান্তরে আমরা যদি অন্যান্য ধর্ম-দর্শনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। ইসলাম পূর্বকালে দাপট ছিল ইহুদী মতবাদের। তবুও বলা মুশকিল তাদের সত্যিকার ধর্ম-দর্শন কি ছিল। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই, তাদের সমাজ-দর্শনে নারী ছিল চরমভাবে অবহেলিত। তাদের সামাজিক আইনে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেবার বিধান অনুমোদিত ছিল। তাই কোন পিতা জাহেলী যুগে নিজের কন্যাকে জীবন্ত প্রোথিত করলে তার কোন বিচার হতো না। জানা নেই, তাদের সমাজ-দর্শনে কি নারীকে কোন প্রাণী জ্ঞান করা হতো, না অন্যকিছু।

গ্রীক দর্শন মন্থন করলে বোঝা যায়, কোন নারী স্বামীর সংসারে আসার পর তাকে 'দাসীরূপে' বিবেচনা করা হতো, বরং মর্যাদা ছিল দাসীরও নীচে। সামান্য ত্রুটি কিংবা অপরাধে স্বামী তার গর্দান উড়িয়ে দিতে পারত এবং এটা ছিল তার বিধিবদ্ধ অধিকার। সামান্য অন্যায়ের শাস্তিস্বরূপ নারীকে ঘোড়ার পায়ের সাথে বেঁধে স্বামী ঘোড়ায় চড়ে হাঁকিয়ে ফিরতো ঘোড়া। অবলা নারী পাথুরে চাটানে পড়ে রক্তাক্ত হতো কিন্তু রা করার ক্ষমতা ছিল না তার।

তারপর এলো ইসলাম। নারীকে করল মহান মর্যাদাবান। ঘোষণা করল, নারী নাড়ীর ধন, পরকালের সম্পদ, অতুল কল্যাণের আধার নারী। নারী নরের সহধর্মিনী, সজনী, সঙ্গিনী। বরং নারীই মহান জননী।

তারপর যখন কথিত আধুনিক সভ্যতার নামে শেকড়ছিন্ন নানারূপ সংস্কৃতি ও সভ্যতার খামার গড়ে উঠল পৃথিবী জুড়ে, তখন নতুন করে নারীকে আবারও বিভিন্ন শিরোনামে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন মোড়কে এস্তেমাল করা হলো। শোনানো হলো চাণক্যপূর্ণ নানা রকমের সান্ত্বনার বাণী। সে বাণীতে সাড়া দিল খোলা মনে অনেকেই। অতঃপর সকল সম্বল উজাড় করে ঢেলে দিল সেই সভ্যতার আলয়-বলয় বিস্তারের স্বপ্নে। তারপর যখন ঘরে ফিরে দেখল তার অস্তিত্বে আঘাতের শতচিহ্ন, যখন দেখল তার ব্যক্তিত্বের রক্তাক্ত দশা, গভীর দৃষ্টিতে যখন অবলোকন করলো তার সম্ভ্রমের পরতে পরতে সুবিধাবাদী মতলববাজদের নখরের ভয়ংকর শত ক্ষত; শিউরে উঠলো নারী, অনেক আধুনিক নারীও। অনেকে ফিরে এলো পরীক্ষিত সনাতন আশ্রয়ে– যেখানে বড় নিরাপদে জীবন কেটেছে তার পূর্বসুরী নারীদের। অনেকে তো স্পষ্ট ভাষায় কাঁচের তৈরি এই ঠুনকো সভ্যতার কঠোর সমালোচনাও করলো।

অবশ্য অবলা নারীর অধিকাংশই যাদের হাতে নির্যাতিতা হয়েছে, আশ্রয়ের আশায় আবারও ফিরে গেছে তাদেরই কাছে। যে সভ্যতার দাবদাহ

তার সম্ভ্রমের সর্বস্ব পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে শান্তির গভীর তামান্না নিয়ে আরও অধিক বিশ্বাস ও আগ্রহের সাথে বুকে তুলে নিচ্ছে এখনও সেই একই সভ্যতার অনল– যে অনল-অগ্নিতে পুড়ে ভস্ম হচ্ছে নারী! যে অনল সৃষ্ট দাহ, যৌতুক আর নির্যাতনের হাবিয়া দোযখে পড়ে বিলাপ করছে লক্ষ-কোটি নারীকণ্ঠ। আহারে অবলা নারী! তবুও ফিরে এলে না তোমার নিরাপদ চির-শাশ্বত বিশ্বস্ত ঠিকানায়– পবিত্র ইসলামের পর্দালংকৃত আশ্রয়ে। হে খোদা বোধোদয় দাও!!

এক বেহেশতী নারীর গল্প

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন তোমাদের সেইসব নারীগণ বেহেশতী যারা তাদের স্বামীদেরকে গভীরভাবে ভালোবাসে, বেশি বেশি সন্তান দেয়, যারা তাদের স্বামীদের কাছে বারবার ফিরে আসে, স্বামীরা তাদের প্রতি নারাজ হলে তারা স্বামীদের সমীপে এসে স্বীয় হাত তাদের হাতে রেখে বলে : আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পলক বন্ধ করব না, কোন স্বাদ গ্রহণ করব না। [আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছিছ সাহীহাহ্ হাদীস : ২৮৭]

সুবিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করল, (হে রাসূল!) উত্তম নারী কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন : যে নারীকে দেখে তার স্বামী প্রীত মুগ্ধ হয়, স্বামীর আদেশের প্রতি অনুগত, যে নারী তার স্বামীর সত্তা ও স্বামীর সম্পদে স্বামীর মত ও রুচির বিরোধিতা করে না। [সুনানুন-নাসাঈ (রহ.), হাদীস : ৩০৩০]

হযরত হুসাইন ইবন মুহ্সিন (রা.) বর্ণনা করেন, আমার ফুফু আমাকে বলেছেন, তিনি একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে হাজির হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কে

তুমি? তুমি বিবাহিতা? তোমার স্বামী আছে? আমি বললাম : জ্বী, আমার স্বামী আছেন! ইরশাদ করলেন : তার সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন? বললাম আমি আমার সাধ্যমত তার আনুগত্যে ও খেদমতে কোন ত্রুটি করি না। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন : খুব ভালো করে বুঝে নাও, সাবধান! সেই কিন্তু তোমার বেহেশত আবার সেই তোমার জাহান্নাম! [তিরমিযি ও আহমাদ, ৪/৩৪১]

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন কোন মহিলা যদি পাঁচ ৬য়াক্ত নামায পড়ে, রমযান মাসের রোযা রাখে, গুপ্তাঙ্গকে অন্যায়কর্ম থেকে সংরক্ষণ করে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করে (মৃত্যুর পর) তাকে বলা হবে বেহেশতের যে দরোজা দিয়ে তোমার মন চায় প্রবেশ কর।' [সহীহ্ ইবন্ হিব্বান : ৬৬০]

বর্ণিত হাদীসগুলোর বক্তব্য স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এতে অবকাশ নেই। উল্লিখিত হাদীস ক'টির সারমর্ম হলো, একজন বেহেশতী নারীর মধ্যে যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা অনিবার্য তাহলো–

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাবন্দ

২. রমযান মাসের সিয়াম সাধনায় যথাযথ সচেষ্ট

৩. স্বীয় গুপ্তাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষায় আপোসহীন

৪. স্বামীর প্রতি প্রেম-প্রেয়সী, গভীর প্রেমময়ী

৫. অধিক সন্তান প্রসবিনী

৬. স্বামীর প্রতি অকুণ্ঠ অনুগত ও তাঁর পছন্দের প্রতি যত্নবান এবং

৭. স্বামীর প্রতি সেবাপরায়ণা।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে একটি বাগান পড়ল। লক্ষ্য করলেন বাগানের মাঝে একটি উট পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে। সাহাবীগণের বাধা উপেক্ষা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটির কাছে যেতেই উটটি সুবোধ শিষ্যের মতো এসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পায়ে সিজদা করল এবং তার নিজস্ব ভাষায় কিছু অভিযোগ করল। ভাষা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝলেন। এবং তার প্রতি যে জুলুম করা হচ্ছে তার নিরসন করলেন। কিন্তু উট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সিজদা করছে দেখে উপস্থিত সাহাবীগণ আরয করলেন : হে

রাসূল! উট আপনাকে সিজদা করছে? তাহলে তো আমরাই এর অধিক হকদার! হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন : শোন, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম তাহলে প্রতিটি নারীকে আদেশ করতাম সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।

সারকথা হলো, ইসলামে জীবনবন্ধু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য শাশ্বত। শুধু পার্থিব জীবনতরী সুশৃংখল সুনিয়ন্ত্রিত ও মধুময় তরঙ্গে চালিত হবার স্বার্থেই নয়– পরকালীন বিজয় কল্যাণ ও মুক্তি লাভের হিসাবেও। তাই জান্নাত প্রত্যাশী, বেহেশতের অনুপম অগণন সুখ ও ভোগে আশাবাদী প্রতিটি মুমিন নারীরই কর্তব্য হলো, পূর্ণ সতর্ক-সন্তর্পণে বিজয়ের এপথে এগিয়ে যাওয়া। আমরা এপথেরই এক সফল উপমাময়ী নারীর প্রভাদীপ্ত কাহিনী তুলে ধরছি এখানে সনদ-সূত্রসহ।

হযরত ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, আমাকে একবার হযরত শুরাইহ্ (রহ.) বললেন : বিয়ে যদি কর তাহলে বনূ তামীমের কোন নারীকে বিয়ে কর। কারণ, তারা খুবই বুদ্ধিমান এবং সমঝদার। বললাম, তারা যে বুদ্ধিমান এবং সচেতন তার কি কোন প্রমাণ আছে? শুরাইহ্ (রহ.) বললেন : সে কথাই বলি, শোন!

এক দুপুরের কথা। আমি গিয়েছিলাম জানাযায় শরীক হতে। সেখান থেকেই ফিরছিলাম। বনূ তামীমের পাশ দিয়েই ফিরছিলাম। পথে একটি ঘর নজরে পড়ল। ঘরের দরোজা খোলা! দরোজায় একজন বুড়ি বসে আছেন আর তার পাশেই এক সুন্দরী রূপসী তরুণী। আমি তাদের কাছে চলে গেলাম। এবং পানি চাইলাম। অথচ আমার তখন তৃষ্ণা পায়নি।

কেমন পানি আপনি পছন্দ করেন? বুড়ির প্রশ্ন!

: সহজে যা দিতে পারেন তাই! সংক্ষেপে বললাম আমি।

বুড়ি মেয়েটিকে বলল : একে দুধ এনে দাও! কারণ, মনে হচ্ছে লোকটি বিদেশী।

মেয়েটি কে? জানতে চাইলাম।

: জারীরের কন্যা যাইনাব।

: বিবাহিতা? জিজ্ঞেস করলাম।

: না, কুমারী, অবিবাহিতা!

: একে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন তাহলে!

'কুফুর' শর্তে দিতে পারি! [মানে যদি বংশ, পেশা, সামাজিক অবস্থান ও আর্থিক মাপে উত্তীর্ণ হও তাহলে দিতে পারি।]

আমি ঘরে ফিরে এলাম। দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম করতে গেলাম। কিন্তু বিশ্রাম আর হলো না। জোহর নামায শেষে খান্দানের কয়েকজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হযরত আসওয়াদ, হযরত মুসায়্যিব ও হযরত মূসা ইবন্ উরফুতা (রহ.)সহ তরুণীর চাচার বাড়িতে গিয়ে ওঠলাম। তিনি আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে বললাম : 'আপনার ভ্রাতুষ্কন্যা যাইনাবকে বিয়ে করতে চাই!'

তারও এতে দ্বিমত নেই! তিনি বললেন।

তারপর সংক্ষেপেই সবকিছু সম্পাদন! কিন্তু পরে আমি লজ্জিত হলাম। জানতে পারলাম– এরা কঠোর হৃদয়ের অধিকারী। আমি ভারি চিন্তায় পড়ে গেলাম। তালাক দিয়ে দেব? শোধালাম নিজেকেই! ভাবলাম, না! তা করব না। আগে কাছে ডেকে দেখি না! যদি আমার কথামত চলে তাহলে তো কোন সমস্যা নেই। অন্যথায় দেখা যাবে!

শা'বী! সত্যি যদি তুমি তখন আমার পাশে থাকতে! বনূ তামীমের নারীরা তাকে উপহার-উপঢৌকনে ভরে দিচ্ছিল। কি যে উচ্ছ্বলতায় প্রাণিত সে দৃশ্য! তারপর তাকে আমার ঘরে– বাসরভুবনে প্রেরণ করা হলো।

আমি বললাম : নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত হলো, কনের কাছে বরের প্রথম সাক্ষাতের সূচনাতে দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে কল্যাণ কামনা করা এবং তার অনিষ্টতা থেকে পানাহ্ চাওয়া! একথা বলে আমি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। নামায শেষে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখি সেও নামাযরত!

নামায শেষ! বনূ তামীমের নারীরা সদলবলে হাজির। আমাকে আমার গায়ের কাপড় খুলে ফেলতে বলল। খুলে ফেললাম। তারা আমাকে পরতে দিল হলুদ রঙের চাদর। তারপর চলে গেল সকলেই। এখন ঘরে কেউ নেই। নিঃশব্দ নীরবতা। শুধু আমি আর যাইনাব। আমি তার প্রতি হাত বাড়াতে চাইলাম। সে বলল : আবূ উমায়্যা ধৈর্য ধরুন! উত্তেজিত হবার তো কিছু নেই! তারপর সে আরও বলল : আল্‌হামদুলিলাহি আহমাদুহু...

'সকল প্রশংসা আল্লাহ'র! আমি তারই প্রশংসা করছি, স্তুতি গাইছি। সাহায্য চাই তাঁরই দরবারে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারবর্গের প্রতি রহমত ও সালাত কামনা করছি। এতে সন্দেহ

নেই, আমি এক অপরিচিতা নারী। আপনার চরিত্র, স্বভাব, অভ্যাস, রুচি ও চাহিদা সম্পর্কে আমার একবিন্দু ধারণাও নেই! তাই অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে আপনার পছন্দের বিষয়গুলো বলে দিন যাতে আমি সেগুলো আঞ্জাম দিতে পারি আর অপছন্দের বিষয়গুলোও জানিয়ে দিন যাতে সেগুলো উপেক্ষা করে চলতে পারি।

সে আরও বলল : 'আপনি আপনার সম্প্রদায়ের এক নারীকে বিয়ে করেছেন অতঃপর আমার সম্প্রদায়ের এক নারীকে। হবে তো তাই যা আল্লাহ চান! হয়তো কল্যাণ, বন্ধুজীবন নয়– সু-সুন্দর বিচ্ছেদ। আমার বক্তব্য এইটুকুই! আমি আমার এবং আপনার জন্যে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইছি!'

শা'বী! তার এই বক্তব্য শোনার পর ভাবলাম, আমাকেও সভূমিকা কিছু বলতে হয়। তাই বললাম : আলহামদুলিলাহি...

'সকল প্রশংসা আল্লাহ'র! আমি তারই প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইছি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত ও সালাত কামনা করছি। তারপর কথা হলো, তুমি এমন কথাই বলেছ, যদি তুমি নিজে তা মেনে চল তাহলে তোমারই উপকার হবে। যদি এর ব্যতিক্রম কর তাহলে এই কথাগুলোই তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়াবে। আমার পছন্দ এই আর অপছন্দ এই। আমরা এক আছি, যেন একই থাকি! যা ভাল ও সুন্দর তা প্রচার করবে যা মন্দ তা চেপে রাখবে।'

এরপর সে বলল : একটি কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি আমার আত্মীয়-স্বজন (শশুর-শ্বাশুড়ি)কে কীভাবে দেখেন! তাদের আসা-যাওয়াটা কি আপনার পছন্দ? বললাম : আমি চাই না তারা আমাকে ক্লান্ত-বিরক্ত করে ফেলুক।

আচ্ছা, প্রতিবেশীদের মধ্যে কাদেরকে আপনি পছন্দ করেন যাদেরকে আমি ঘরে প্রবেশ করতে দেব আর কারা এমন আছে যাদেরকে আপনি পছন্দ করেন না এবং আমিও ঘরে ঢুকতে দেব না! আমি বলে দিলাম : অমুক আমার পছন্দের আর অমুক অপছন্দের।

কাযী শুরাইহ্ (রহ.) বলেন : শা'বী! তার সাথে সেই রজনীটি ছিল আমার আনন্দঘন তৃপ্তিপূর্ণ রাত। সারাটা বছরই সে আমাকে ভালোবাসার ফুল, আন্তরিকতার সুবাস দিয়ে আমোদিত করে রেখেছে। আমি তার মাঝে কোন ত্রুটি দেখিনি– শা'বী৷

বছর শেষ!

আমি বিচারালয় থেকে ঘরে ফিরেছি। দেখি এক পৌঢ়া নারী মেয়েদেরকে তালীম দিচ্ছে! জানতে চাইলাম কে? তারা বলল : আপনার মুহ্তারামা শ্বাশুড়ি! আমি ঘরে ঢোকার পর তিনি এসে আমাকে সালাম দিলেন। আমি উত্তর দিলাম এবং বললাম : আপনি কে? বললেন : আমি আপনার জীবনসঙ্গিনীর জননী!

: আল্লাহ আপনাকে তাঁর নৈকট্য দান করুন! বেহেশত নসাব করুন!

: আপনার স্ত্রীকে কেমন পেয়েছেন? তিনি জানতে চাইলেন।

: খুবই ভালো, উত্তম স্ত্রী।

তারপর তিনি বললেন : আবূ উমাইয়্যা! মেয়েরা দুই কারণেই সাধারণত বিপথগামী হয়ে থাকে।

১. যখন তারা 'মা' হয়ে যায় এবং

২. স্বামীদের পক্ষ থেকে যদি অধিক সম্মান ও গুরুত্ব পায়!

যদি কখনো মন্দ কিছু আপনার অনুভব হয়, সংশয় জাগে হাতে বেত তুলে নেবেন। আল্লাহর কসম! মন্দ নারীর চাইতে নিকৃষ্ট কোন সম্পদই মানুষের ঘরে নেই!

এর প্রয়োজন হবে না। আপনি তাকে উত্তম শিক্ষাই দান করেছেন।

আপনার শশুরালয়ের লোকেরা সাক্ষাৎ করতে আসুক এটা কি আপনি চান?

বললাম : অবশ্যই, যখন খুশি!

'হৃদয় যারা জয় করেছে
তাদের আবার বাধা কিসে!'

কাযী শুরাইহ্ বলেন : তারপর প্রতি বছরই আমার শ্বাশুড়ী আসতেন এবং আমাদেরকে খুবই মূল্যবান পরামর্শ ও নসীহত করে যেতেন।

এভাবে সুদীর্ঘ বিশ বছর কেটেছে আমাদের দাম্পত্যের। সম্প্রীতি, ভাব ও আন্তরিকতায় কানায় কানায় পূর্ণ ছিল আমাদের দিনগুলো। কিন্তু একদিন হঠাৎ করেই আমি তার প্রতি জুলুম করে বসলাম। সত্যিই জুলুম করেছিলাম আমি তার প্রতি।

ঘটনাটি ছিল বড়ই বেদনাদায়ক। ভোর হয়েছে। ফজর নামাযের সময় ছুঁই ছুঁই করছে। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ইকামতের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমি

ছিলাম মহল্লার মসজিদের ইমাম। মুয়াজ্জিনের ইকামত শোনে যখন আমি ঘর থেকে বের হতে উদ্যত হলাম তখনই লক্ষ্য করলাম, একটি সাপ ছুটে আসছে। আমি হাতের কাছের একটি পাত্র তুলে ছুঁড়ে মারলাম সাপের প্রতি। সাপ আক্রান্ত হলো। আমি বললাম : যাইনাব! তুমি নড়ো না। আমি নামায পড়ে এক্ষুণি আসছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য! ততক্ষণে স্বপ্নের পায়রাগুলো তাড়িয়ে দিয়েছে অনেকদূর। দ্রুত ছুটে এসে দেখি– প্রেয়সীর সোনামুখ বেদনায় নীল! দংশনে-যন্ত্রণায় বোবা হয়ে পড়ে আছে নিথর দেহ। হিমেল বদনে তার হাত রাখলাম। সূরা ফাতিহা, নাস ও ফালাক পড়ে ফুঁকলাম প্রাণপণে। ওঝা ক্লান্ত! বিমার শায়িত চিরনিদ্রার কোলে।

ভেতরটা এখনও নড়ে ওঠে তার আনুগত্যের কথা মনে পড়লেই। জীবনটা সঁপে দিল। তবুও আমার কথা রাখতে গিয়ে একবিন্দু নড়াচড়া করল না! যতই ভাবি, নিজেকে জঘণ্য অত্যাচারী মনে হয়!

শা'বী! বিয়ে যদি কর এই খান্দানেই কর! [ইমরাআতুম-মিন আহলিল জান্নাহ, আনসার জুবাইর মুহাম্মাদী, ১৫–১৯ পৃ.]

এইতো বেহেশতী নারী! যাঁদের কথা আলোচিত হয়েছে প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণীমালায়! পার্থিব চাণক্যের ভেলকিবাজির পথ ছেড়ে, নশ্বর ক্ষুদ্র-ক্ষণস্থায়ী নষ্ট সুখের রঙিন পথমুখি সভ্যতার ভয়ংকর গলি থেকে চিরন্তন শাশ্বত মুক্তি ও বেহেশতের এই আলোকিত রাজপথে আমাদের সচেতন মা-বোনেরা এগিয়ে আসবেন কি? আহা, সত্যিই যদি তারা সচেতন হতে পারতেন! তারা যদি স্থায়ী-অস্থায়ী, ক্ষুদ্র-অসীম আর নশ্বর-অবিনশ্বরের পার্থক্যটা প্রাণখোলে উপলব্ধি করতে পারতেন!!

উম্মে উমারা (রা.) : এক চিরবিপ্লবী নারী

প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বরকতপূর্ণ আদর্শ নিকেতন বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছিল এমনসব পুণ্যবান সঙ্গীদের উপস্থিতিতে যাঁরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারকে হরফে হরফে বাস্তবায়ন করেছিলেন, যাঁরা জীবন সাধ স্বপ্ন সবকিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন আল্লাহর দীন আর প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আলোকিত আদর্শকে। ক্ষণজন্মা ভাগ্যবান সেইসব মহৎপ্রাণদের অন্যতম একজন হলেন হযরত উম্মে উমারা (রা.)। প্রকৃত নাম নাসীবা বিনতে কা'ব ইবন আমর (রা.)। খাযরাজ বংশের ভাগ্যতারকা এই মহিয়সী প্রিয় নবীজীর বিখ্যাত মাদানী সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম।

তাঁর ভাইদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন কা'ব আল মাযানী (রা.) বদরযুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। যুদ্ধ করেছিলেন ইসলামের পক্ষে। অবশেষে তিনি মদীনাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন হযরত উসমান (রা.)। তাঁর দ্বিতীয় ভাই হযরত আবদুর রহামন ইবন কা'ব (রা.)! তিনি সামান পত্রের অভাবে তাবুক যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি বলে কেঁদে কেঁদে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তখন তাঁর এবং তাঁর মত অক্ষম পূর্ণঈমানদারদের সান্ত্বনাস্বরূপ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়–

تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اِلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوا

অর্থাৎ "তাঁরা অর্থব্যয়ে অসামর্থজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেল।" [তাওবা : ৯২]

এতে খুব সহজেই একথা প্রতিভাত হয়ে উঠে, হযরত উম্মে উমারা (রা.)-এর জন্ম হয়েছিল এক ভাগ্যবান নূরোজ্জ্বল পরিবারে।

উম্মে উমারা প্রথম বিয়ে করেছিলেন যায়েদ ইবন আসিমকে। হযরত যায়েদ ইবন আসিম ইবন কা'ব ইবন মুনযির আল-আনসারী (রা.)ও ছিলেন একজন সুবিখ্যাত সাহাবী। ইসলামের প্রথম সারির সৈনিক এই মহান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন বাইআতে আকাবার ঐতিহাসিক বৈঠকে। তিনি উপস্থিত ছিলেন বদরযুদ্ধে। উহুদ যুদ্ধেও শরীক ছিলেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে। অবশ্য তাঁর সাথে উম্মে উমারার বিয়ে হয়েছিল ইসলামপূর্ব কালে। তাঁর ঘরে হাবীব, আবদুল্লাহ নামে দু'জন পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল। ভাগ্যবতী মাতার এই উভয় পুত্রই ছিলেন প্রিয় নবীজীর সম্মানিত সাহাবী।

হযরত যায়েদের পর তিনি বিয়ে করেন গায্য়াহ্ ইবন আমর ইবন আতিয়্যাহ্ আনসারীকে। তিনিও ছিলেন একজন অন্যতম আনসারী সাহাবী। তাঁর এই সংসারের দুই সন্তান যামরাহ্ এবং তামীম। তাঁরাও ইসলামের প্রথম কালের মুসলমান। তাঁরাও শরীক ছিলেন আকাবার বাইআতে এবং উহুদ যুদ্ধে।

কিন্তু হযরত উম্মে উমারার জন্যে সবচে' বড় গর্বের বিষয় যেটা তাহলো, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ওফাতের পর মুসায়লামা দাবী করে নবুওয়তের। এই নিয়ে সৃষ্টি হয় মহা তোলপাড়। প্রায় চল্লিশ হাজার যুবক যোদ্ধাকে সঙ্গে করে মুসায়লামা অবতীর্ণ যুদ্ধের মাঠে। বীর সেনানী হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে অগ্রসর হোন মুসলিম যোদ্ধাগণ। সংঘাত হয় প্রচণ্ড। প্রায় সত্তরজন হাফেযে কুরআন সাহাবী এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। অবশেষে হযরত খালিদ (রা.) মুসায়লামাকে সম্মুখ লড়াইয়ের আহ্বান জানালে সে তার 'হাদীকাতুর রাহমান' নামক বাগিচায় গিয়ে আত্মগোপন করে। চারদিক থেকে প্রাচীরঘেরা এই বাগানে আশ্রিত হবার পর প্রহরীরা ভেতর থেকে দরোজা বন্ধ করে দেয়। তখন সাহাবী হযরত বারা ইবন মালিক সঙ্গীগণকে বললেন : তোমরা আমাকে ধরে দেয়ালের উপর দিয়ে ছুঁড়ে মার। জানবাজ বন্ধুগণ তাই করলেন। দুঃসাহসী বারা উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়তেই এগিয়ে আসল বাগানের প্রহরী দল। প্রবল অনলরোষে দীপ্ত বারা (রা.) অবুঝ শিশুকে কাবু করার মত প্রহরীদেরকে পদতলে ফেলে ছুটে যান ফটকের দিকে। ফটক মুক্ত করে দিতেই এগিয়ে

আসেন প্রতাপতেজী মুজাহিদগণ। মিছে লুকোবার চেষ্টা করে মিথ্যুক মুসায়লামা। কিন্তু বীরযোদ্ধা দুই সাহাবী হযরত উম্মে উমারার পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা.) এবং হযরত হামযা (রা.)-এর ঘাতক [পরবর্তীতে রাদিয়াল্লাহু আনহু] হযরত ওয়াহ্শী (রা.) ধরে ফেলেন মুসায়লামাকে। নাঙা তলোয়ারের প্রচণ্ড এক আঘাতে কুপোকাত করে ফেলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা.), সেই সঙ্গে বর্শা দ্বারা আঘাত করেন হযরত ওয়াহশী (রা.)! অতঃপর খোদার দুশ্‌মন, নবীর দুশমন মুহূর্তে বিদায়!

নবুওয়তের জঘন্য দুশমন মুসায়লামাকে হত্যা করার কৃতিত্ব যে মহান মুজাহিদের তাঁরই গর্বিতা জননী হযরত উম্মে উমারা (রা.)।

দ্বিতীয় পুত্র হাবীব ইবন যায়েদ ইবন আসিম শরীক ছিলেন আকাবার শপথ বৈঠকে। নবীজীর হয়ে যুদ্ধ করেছেন উহুদে খন্দকে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জীবনের শেষ সোপানে উপনীত। মিথ্যাবাদী মুসায়লামার পক্ষ থেকে চিঠি এলো। সে দাবী করে পাঠাল, সেও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মত নবী। তবে পুরো দুনিয়ার নয়। আধা পৃথিবীর। বাকিটার নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! এর জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর পাঠালেন এই ভাষায় :

"*বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম*

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র পক্ষ থেকে মুসায়লামা কায্‌যাবের নামে–

সত্যপথ অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর কথা হলো, সারা পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ! তিনি যাকে চান তাকেই তাঁর কর্তৃত্ব দান করেন। আর উত্তম পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্যে।"

হেদায়েতের এই দীপ্ত আহ্বান পৌঁছার পরও তার টনক নড়েনি। আলোর পথে ফিরে আসেনি। বরং গোমরাহির মাত্রা আরও বেড়েছে। অবশেষে বাধ্য হয়ে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নামে আরেকটি পত্র লিখেন। এবং এই পত্রের দূত নির্বাচিত হন হযরত উমারার দ্বিতীয় পুত্র হাবীব! প্রিয় নবীজীর বাণী নিয়ে পৌঁছে যান ভণ্ড মুসায়লামার আস্তানায়। চিঠি পেয়ে মুসায়লামা জ্বলে ওঠে– চামচিকা যেভাবে আলো দেখলে জ্বলে ওঠে। বন্দী করে হযরত হাবীবকে। নির্যাতন চলে অবিরাম।

আঘাতে আঘাতে যখন তিনি ক্লান্ত তখন মুসায়লামা ভাবে, এবার বোধ হয় কাবু হয়ে পড়েছেন হাবীব। বিরাট সমাবেশ ডাকে মুসায়লামা। বিশাল জনতার ভীড়ে ডেকে আনে হযরত হাবীবকে। আর মনে মনে ভাবে, একটা

কেরামাতি দেখাব আজ। হযরত হাবীব (রা.) সামনে আসতেই মুসায়লামা জিজ্ঞেস করে–

: তুমি বিশ্বাস কর, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল?

: হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল!

: তুমি কি বিশ্বাস কর আমি আল্লাহর রাসূল?

মুসায়লামার মুখ তখন রাগে-রোষে বিবর্ণ। শরীর কাঁপছে, আর হযরত হাবীব (রা.) উপহাসের সুরে বললেন : আমি শোনতে পাচ্ছি না!

কথাটি এভাবে কয়েকবার আওড়াবার পর তো মুসায়লামার মাথায় রক্ত! চিৎকার করে ডাকল জল্লাদকে। আদেশ করল, একে জীবন্ত অবস্থায় কেটে টুকরা টুকরা কর! আদেশ পালিত হলো নির্মমভাবে। প্রিয় নবীজীর এক প্রিয়তম সাহাবীর একেকটি অঙ্গ কেটে কেটে আলাদা করা হলো! মর্দে মুজাহিদ দীপ্ত বিশ্বাস অসীম জযবা আর তরঙ্গায়িত নবীপ্রেমের চির শাশ্বত উপমা স্থাপন করে গেলেন স্বীয় জীবনকে তিলে তিলে বিলিয়ে দিয়ে।

তাঁর শাহাদাতের সংবাদে বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । আর জননী উম্মে উমারা এই নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর নির্মম ঘটনায় শোকে ক্ষোভে বোবা বনে যান। শপথ করে বলেন : আমি এর প্রতিশোধ নেব!

কুদরতের কী বিস্ময়কর লীলা! আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অবশেষে হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে যখন মুসায়লামার উপর হামলা করা হয় তখন মুসায়লামাকে হত্যা করেন এই হাবীব (রা.)-এর সহোদর হযরত আবদুল্লাহ (রা.) ও ওয়াহ্শী (রা.)!

শুধু কি তাই? হযরত উম্মে উমারা (রা.) নিজেও শরীক হয়েছিলেন এই যুদ্ধে। সেকি রুদ্ররূপ জননীর। ডান হাতে নাঙ্গা তলোয়ার আর বাম হাতে শাণিত বর্শা। মুসায়লামার যখন পতন হলো তখন তার চোখে মুখে উল্লাসের ঝিলিক। চিৎকার করে বলে ওঠেন :

أَيْنَ عَدُوُّ اللهِ - مُسَيْلَمَةُ

'আল্লাহর দুশমন মুসায়লামা কোথায়?'

অথচ তাঁর শরীর তখন ক্ষত-বিক্ষত। ঝরে পড়ছে লাল টকটকে উষ্ণ ক্ষুব্ধ লহু! আর মুসায়লামার পতিত মুখে তিনি দেখছেন তার শহীদ সন্তানের বিজয়ী মুখ!

হযরত উম্মে উমারা (রা.)-এর বাইআতে আকাবায় শরীক হবার ঘটনাটিও বেশ চমৎকার! তিনি নিজেই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এইভাবে–

বাইআতে আকাবার রজনীতে আমিও উপস্থিত ছিলাম এবং বাইআতও নিয়েছিলাম অন্য সকলের সাথে। এবং সেটা এইভাবে– পুরুষগণ নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করলেন। হযরত আব্বাস তখন নবীজীর হাত ধরে আছেন। বাইআত সমাপ্ত হবার পর দেখা গেল আমি আর উম্মে মানী বাকি আছি। তখন আমার স্বামী আযয়াহ্ ইবন আমর (রা.) নবীজীর খেদমতে আরয করলেন : হে রাসূল! এই দুইজন নারীও আমাদের সাথে এসেছে। তারাও বাইআত গ্রহণ করতে চায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন : তোমাদেরকে যেসব বিষয়ে বাইআত করিয়েছি তাদেরকেও সেসব বিষয়ে বাইআত করে নিলাম। আর আমি মেয়েদের সাথে করমর্দন করি না।

উল্লেখ্য, বাইআতে আকাবার এই দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠানটি সংঘটিত হয়েছিল নবুওতের ত্রয়োদশ সালে। সত্তরজনের বেশি পুরুষ আর ভাগ্যবতী এই দুই নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন এই ঐতিহাসিক শপথ অনুষ্ঠানে। সুখে-দুঃখে, কালে-অকালে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের নিঃশর্ত আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা। যে শপথ ছিল অসীম ত্যাগ বিসর্জন ও বিপ্লবের বুনিয়াদী উৎস। এবং পরবর্তীকালের বিশ্বময় ইসলাম ও উম্মাহ সেই বাইআতে আকাবারই উত্তম ফসল।

উম্মে উমারা (রা.)-এর আরেকটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি ইসলামী বিপ্লব ও চেতনার দীপ্ত খণ্ড বাইআতুর রিদওয়ানেও শরীক ছিলেন।

ঘটনাটি ছিল এই– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন, তিনি বাইতুল্লাহ প্রবেশ করেছেন। মাথা মুণ্ডন করেছেন। বাইতুল্লাহ'র চাবি হস্তগত করেছেন তিনি এবং সাহাবীগণ আল্লাহর ঘর তাওয়াফও করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের কথা সাহাবীগণকে জানালেন। শোনে সকলেই ভীষণ খুশি। নবীজী এও জানালেন তিনি শীঘ্রই উমরা করতে যাবেন। একথা ছড়িয়ে পড়তেই এক হাজার চারশ সাহাবীর বিশাল কাফেলা প্রস্তুত হয়ে গেল। তাঁদের মধ্যে চারজনমাত্র নারী ছিলেন। সেই চারজন হলেন নবীজীর জীবনসঙ্গিনী হযরত উম্মে সালমা, উম্মে উমারা, উম্মে মানী ও উম্মে আমির (রা.)! কিন্তু কুরাইশরা পথে বাধা দেয়। ফলে জ্বলে উঠে যুদ্ধের লেলিহান। সে এক কঠিন মুহূর্ত।

এ মর্মে হযরত উমারার বর্ণনাই শোনা যাক। তিনি বলেন : একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তাঁবুতে এলেন। তখন হঠাৎ করে সংবাদ এলো, হযরত উসমানকে (রা.) কুরাইশরা শহীদ করে দিয়েছে। তখন তিনি আমাদের তাঁবুতে উপবেশন করলেন আর বললেন : আল্লাহ তাআলা আমাকে বাইআত গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। তখন বাইআত গ্রহণ করার জন্যে মানুষের ঢল নামল। এবং আমাদের সামানপত্র মাড়িয়ে একেবারে শেষ। আর মুসলমানগণ রণসাজে সজ্জিত। অথচ আমরা বেরিয়ে ছিলাম উমরা করতে। আমাদের হাতে অস্ত্র বলতে তেমন কিছুই নেই।

আমার কাছে একটি শাণিত ছুরি ছিল। আমি সেটা নিয়ে একটি খুঁটির কাছে দাঁড়িয়ে গেলাম। এবং বলে দিলাম যদি কোন বেঈমান আমার কাছে আসে তাহলে তাকে হত্যা করে ছাড়ব। হিজরী ষষ্ঠ সালে অনুষ্ঠিত বৃক্ষতলায় সম্পাদিত এই শপথকে বাইআতুর রিদওয়ান বলা হয়। এই বাইআত অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন নবীজী তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন : তাঁদের একজনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। সুসংবাদের আলোয় উদ্ভাসিত এই ভাগ্যবানদের অন্যতম একজন হযরত উম্মে উমারা (রা.)!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে হযরত উম্মে উমারা (রা.)-এর মর্যাদাও ছিল ঈর্ষণীয়। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন : 'উম্মে উমারা! তুমি যা পার তা আর কে পারবে?'

তাইতো! ইতিহাসে এমন ভাগ্যবতী নারী আর ক'জন আছে শুনি! নিজে নবীজীর কাছে দুই দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনায় সত্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শপথ গ্রহণ করেছেন, সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন, আল্লাহর দীনের জন্যে রণাঙ্গনে বীরাঙ্গনার বেশে জ্বলে উঠেছেন, প্রিয় নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয়ংকর শত্রু মুসায়লামার হাতে নবীজীর মর্যাদা রক্ষায় নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন এক পুত্র, অন্য আরেক জানবায খোশনসীব পুত্র হত্যা করেছেন নবীজীর এই কুলাঙ্গার দুশমনকে।

ইসলামের ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক অধ্যায় উহুদ যুদ্ধ। যে যুদ্ধে স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্রান্ত হয়েছিলেন মারাত্মকভাবে। হযরত হামযা (রা.)-এর মত বীরযোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেছিলেন যে যুদ্ধে, যে যুদ্ধ মদীনায় ছড়িয়ে দিয়েছিল বেদনার সুর। মাতম ওঠেছিল ঘরে ঘরে। একদল জানবায বীরযোদ্ধা নিজেদের জীবনকে বাজি

রেখে লড়াই করে যাচ্ছিলেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এবং আল্লাহর দীনকে রক্ষা করার জন্যে। আর সেই জানবায অসীম দুঃসাহসী মুজাহিদদের অন্যতম ছিলেন হযরত উম্মে উমারা (রা.)! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন :

مَا الْتَفَتُّ يَمِيْنًا وَشِمَالًا اِلَّا رَأَيْتُهَا تُقَاتِلُ دُوْنِيْ

'আমি ডানে-বামে যে দিকেই নজর দিয়েছি, দেখেছি উম্মে উমারা আমার জন্যে লড়াই করছে।'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই শোনতেন উম্মে উমারার অসুখ-বিসুখের কথা নিজেই চলে যেতেন তাঁর ঘরে। খোঁজ-খবর নিতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কিছু খেতে দিলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেও সঙ্গে শরীক করতেন।

তাই এই বীরাঙ্গনা ভাগ্যবতী নারী যখন ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন তখন তার সেবায় এগিয়ে যান সেনাপতি খালেদ ইবন ওয়ালীদ এবং নার্সিং সম্পর্কে অভিজ্ঞজনদেরকে তার সেবায় নিযুক্ত করেন।

খলীফা হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)ও তাঁর যত্ন করতেন যথাসাধ্য। অবশেষে প্রিয় নবীজীর নিখাঁদ ভক্ত, আল্লাহর দীনের একনিষ্ঠ সেবিকা আদর্শের আপোসহীন পতাকাবাহী এই মহান নারী হিজরী ১৩ সালে স্বীয় প্রভুর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় নেন। চিরনিদ্রায় শায়িত হন জান্নাতুল বাকীতে। রাদিয়াল্লাহু আনহা!![১]

[১] **তথ্যসূত্র :**

১. রিজালুন হাওলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – খালিদ মুহাম্মদ খালিদ

২. খেলাফতে রাশেদা কা আহ্দে যাররি – কাযী যায়নুল আবিদীন মিরাঠী (রহ.)

৩. নূরুল বাসার ফী সীরাতি খায়রিল বাশার – আল্লামা হিফযুর রহমান সিওহারবী (রহ.)

৪. মাসিক আর-রাবেতা – রাবেতার মুখপত্র [সংখ্যা ৪০১]

জ্ঞানের ভুবনে নারী : কয়েকটি আলোকিত উপামা

জ্ঞান মানে আলো। পথের দিশারি জ্ঞান। জীবন পথের বাতিঘর জ্ঞান। তাই এই জীবন সাহারায় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই প্রয়োজন নারী পুরুষ সকলের। খোদার বিশাল এই বসুন্ধরায় যাদের বাস তাদের সকলের জন্যেই অপরিহার্য জ্ঞান। জ্ঞানের আলোক প্রদীপ ব্যতিত জীবন নদীর বাঁক অতিক্রম করা নারী পুরুষ করো পক্ষেই সম্ভব নয়।

অবশ্য এখানে আমি কোনভাবেই এ তর্কে জড়াতে চাই না, জ্ঞান মানে কি? আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান না ধর্মীয় ইল্‌ম। আমি বরং বলতে চাই, প্রভিটি সচেতন বিবেকবান মানুষেরই জীবনের একটা লক্ষ্য এবং টার্গেট থাকে। সে তার সকল সাধ সাধ্য চেষ্টা আরাধনা উজার করে দিয়ে স্বীয় লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়। এর বিপরীতে লক্ষ্যহীন মানুষ যে জগতে নেই সেই কথা বলছি না। বরং তারা যখন প্রচলিত জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন আমি ও তাদেরকে অনর্থক উত্যক্ত না করে বিচ্ছিন্নই থাকতে দিতে চাই। জীবন যাদের নির্ধারিত টার্গেটের সাথে গ্রন্থিত তাদের সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি এই টার্গেটের বিচারে মানুষ দুই দলে বিভক্ত। ১.পরকালে বিশ্বাসী, ২. অবিশ্বাসী! বিশ্বাসীজনদের টার্গেট হলো, পরকালীন বিজয় ও মুক্তি আর অবিশ্বাসীদের টার্গেট হলো, শুধুই পার্থিব এই ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত জীবনে উন্নতি সমৃদ্ধি ও সফলতা। সন্দেহ নেই, এই শ্রেণীর জন্যে এই এক মুঠো জীবনের বিন্দু বিন্দু উন্নতি সমৃদ্ধি ও সফলতা লাভের সমূহ নিয়ম-নীতি, কলা কৌশল-ই জ্ঞান। পক্ষান্তরে পরকাল যাদের টার্গেট, পরকালীন বিজয় সফলতা ও নাজাত যাদের কাম্য তাদের জন্যে তো এ পথের দিক দিশা, বিধি-বিধান, আদেশ নিষেধই জ্ঞান ও ইলম বলে বিবেচিত হবে–এইতো স্বাভাবিক। এও স্বাভাবিক, টার্গেট ও লক্ষ্য বিচারে বিভক্ত এই দুই শ্রেণী এই দুই ধরণের জ্ঞান সাধনায়-ই যুগে যুগে পরিচয় দিয়েছেন বর্ণনাতীত ত্যাগ সাধনা ও ধৈর্যের। বস্তুবাদী সাধনার মহা বিজয় হিসাবে উন্মোচিত হয়েছে আবিস্কারের অসংখ্য পথ। আলোকিত

হয়েছে মাটির পৃথিবী বিজ্ঞানের প্রদীপে। পক্ষান্তরে পরকাল বিশ্বাসী সাধকদের বিশ্বাসিক জ্ঞান সাধনার বরকতে সৃষ্টি হয়েছে এমন অনেক আল্লাহ বিশ্বাসী দরদী মানুষ–যারা শুধু আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের সন্তুষ্টির তরে বিলিয়ে যায় নিজের জীবন সম্পদ সপ্ন সাধ সবকিছু।এবং এই একই কামনায় তারা মানবের বরং মাটির পৃথিবীর সকল সৃষ্টির জন্যে সদা কল্যাণকামী, উপকারী, সমব্যথী ও একান্ত বন্ধু। তাদের পদ ছোঁয়ায় পৃথিবী, সমাজ ও রাষ্ট্র বলবান হয়ে ওঠে শৃংখলাবোধ, কল্যাণপ্রীতি, অন্যায় ও অবিচার দমন ও সত্যের প্রতি বলিষ্ঠ আহবানে।

এই যে জীবন ব্যাপী শান্তি শৃংখলা সততা ও একতা প্রতিষ্ঠার অমিয় জ্ঞান–জ্ঞানের এই ভুবনে নর যেমন অবিনশী অবদানে উজ্জ্বল ইতিহাসের পাতায় তেমনি 'নারী'রাও উজ্জ্বল তাদের বলিষ্ঠ অতীতের আলোকে। আমাদের ইসলামী জ্ঞানের ইতিহাস যাদের জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত সেসব নারীদের মধ্য থেকে কয়েকটি উপমা পত্রস্থ করছি আমরা এখানে।

হযরত আইশা (রা.)

ইসলামী ইতিহাসের প্রথম 'নারী' মুফতী ও মুহাদ্দিস হওয়ার অধিকারিনী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা.) ছিলেন স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর যুগের এক অন্যতম কেন্দ্রিয় জ্ঞান-পণ্ডিত। জটিল ও সমকালীন কঠিনতর জিজ্ঞাসার তাগিদ নিয়ে তার দরবারে হাজির হতেন স্বয়ং বড় বড় সাহাবী। এ মর্মে বিখ্যাত সাহাবী আবু মুসা আশআরী (রা.)বলেন, আমরা প্রিয় নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীরা যখনই কোন জিজ্ঞাসা নিয়ে হযরত আইশা (রা.) এর কাছে হাজির হয়েছি তাঁর কাছে আমরা সমাধান পেয়েছি। [তিরমিযী: ৩৮৭৭]

জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের পরিধি বিচার করতে গিয়ে ইমাম যুহরী (রহ.) বর্ণনা করেছেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন; যদি এই উম্মতের সকল নারীর (উম্মাহতুল মুমিনীনসহ) ইলম একত্রিত করা হয় তাহলে আইশার ইলম সকলের ইলমের চাইতে বেশী হবে। [তাবরানী, কাবীর,২৩ : ১৮৪]

ইমাম বালাযিরী(রহ.) বলেছেন, হযরত আইশা (রা.) ছিলেন তাঁর সময়ের সর্বোচ্চ আলিম–বড় বড় সাহাবীও তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইতেন। [আনসাবুল আশরাফ : ৪১৮ পৃ.] কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (রহ.)বলেছেন,

হযরত আইশা (রা.) হযরত আবু বকর, উমর,উসমান ও আলী (রা.) এর যুগেই মুফতী হিসাবে স্বতন্ত্র উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। [প্রাগুক্ত]

হযরত আইশা (রা.)-এর ইলমের পরিধি যেমন ছিল বিস্তীর্ণ তেমনি ধারণাও ছিল বিস্তর। পবিত্র কুরআন থেকে শুরু করে ফারায়েয, হালাল-হারাম, ইসলামী আইন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কাব্য-সাহিত্য, আরব্য রূপকথা ও বংশ বিদ্যা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল শেকড়স্পর্শী, বিস্তৃত এবং আকাশব্যাপী। [আল-মুসতাদরাক : ৪/১১]

শিক্ষাবিদরা বলেছেন : উলামা এবং মুহাদ্দিসগণের মতে পবিত্র ইসলামের, ইসলামী জ্ঞানের এক চতুর্থাংশ আমরা পেয়েছি হযরত আইশা (রা.) এর সূত্রে। বিশেষ করে ইস্‌লামী জীবন দর্শনে নারী জাতির জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অমর ও শাশ্বত শিক্ষার স্বন্দেশ আমরা পেয়েছি হযরত আইশা (রা.) এর মাধ্যমেই।

হযরত আইশা (রা.) যে শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দেখা এবং শোনা কথাগুলোকেই বর্ণনা করতেন তা নয়। বরং তিনি ছিলেন মুজতাহিদ। নব-উদ্ভুত সমস্যাবলীর সমাধান দিতেন স্বীয় গবেষণাধর্মী চিন্তা যোগ্যতা ও দলীল ভিত্তিক ইজতিহাদের আলোকে। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যাঁরা সংখ্যাধিক্যে উন্নীত হযরত আইশা (রা.) ছিলেন তাঁদের-ই অন্যতম। তদীয় সূত্রে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা দুই হাজার দুই শত দশটি। আর এ কারণেই জগদ্বিখ্যাত জ্ঞান-পুরুষ হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.) হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)এর সাথে হযরত আইশা (রা.) এর নাম ও উল্লেখ করা হয়।

হযরত আমিনা রামলিয়্যাহ্

আমিনা রামলিয়্যাহ্ (রহ.) হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর সুবিখ্যাত মুফতী ও আলেমদের অন্যতম। জন্ম জ্ঞানের শহর বাগদাদে, আনুমানিক হিজরী ১৬৩ সালে। বাগদাদের উপকণ্ঠেই উপশহর রামলাহ। বেড়ে ওঠেন সেখানেই। শৈশবেই জ্ঞানের প্রতি-শিক্ষার প্রতি প্রচন্ড অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু মা-বাবা ছিলেন নেহায়েত গরীব। তাই ঘরের ধর্মীয় পরিবেশ, আপনজনদের দীনি ইলম থেকে যৎ সামান্য জ্ঞানের আলো সংগ্রহ করেছেন অতি যত্নের সাথে। অবশ্য এতে জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটেনি, বরং আরও বেড়েছে।

তারপর যখন খানিকটা বড় হয়েছেন মায়ের সাথে যান হজ করতে। উপস্থিত হোন পবিত্র মক্কা নগরে। সেখানে গিয়ে দেখেন পবিত্র মসজিদুল হারামে সমকালীন এক মহান বুযুর্গ আলেমে দীন দীনি শিক্ষার দর্স দিচ্ছেন। মায়ের অনুমতি নিয়ে আমিনা শরীক হয়ে পড়েন দীনি শিক্ষার আলোকিত কাফেলায়। শুরু হয় নব উদ্যমে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও তাফসীরের জ্ঞানার্জন। কিন্তু সে যাত্রা বেশি দুর অগ্রসর হতে পারেননি। মহান শিক্ষকের ওফাত হয়ে যায়। তবুও থমকে দাঁড়াননি আমিনা রামলিয়্যা (রহ.)! ছুটে যান পবিত্র শহর মদীনায়। ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত ইমাম মালিক (রহ)এর সান্নিধ্যে। হাদীসের অমৃত সুধা পানে হৃদয় মন চেতনা বিশ্বাস হতে থাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর। প্রচুর সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করেন ইমাম মালিক (রহ.) এর দরবার থেকে। বিখ্যাত হাদীস গবেষক আল্লামা হাফিয ইব্ন আবদুল বার (রহ.) এর গবেষণা মতে আমিনা রামলিয়্যার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা প্রায় একশ।

মদীনা থেকে পুনরায় মক্কা আসেন। সেখানে হযরত ইমাম শাফিঈ (রহ.) এর কাছ থেকে ফিকাহ্ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। অতঃপর জ্ঞান ও গবেষণার শহর ইরাকের কুফা নগরীতে এসে সেখান কার সমকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন। তারপর ফিরে আসেন স্বীয় মাতৃভূমি রামলায়। তখন চার দিকে তাঁর গভীর জ্ঞান-পান্ডিত্যের তুমুল আলোচনার ঝড়। দিক দিগন্ত থেকে জ্ঞান পিপাসুগণ ছুটে আসেন আমিনা রামলিয়্যার দরবারে। সমকালীন অনেক বড় বড় আলিমও হাদীসের সনদ লাভ করার উদ্দেশ্যে ছুটে আসেন। জ্ঞানের সাথে বুযুর্গীর উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন আমিনা। তাই সমকালীন পৃথিবীর বিখ্যাত ওলী হযরত বিশর হাফী (রহ.) পর্যন্ত তাকে অত্যন্ত তাযীম করতেন, সাক্ষাৎ করে দুআ চাইতেন। হযরত ইমাম আহমাদ (রহ.)ও তাঁর ইলম ও বুযুর্গীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন! [মিছালী খাওয়াতীন, ১২৩ পৃ]

কারীমা বিনতে আহমাদ (রহ.)

হিজীর পঞ্চম শতাব্দীর পৃথিবী বিখ্যাত আলেমেদীন। বিখ্যাত মনিষী আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবন আবু হাতিমের কন্যা। জন্ম ইরানের মার্ভ শহরে। সমকালীন বড় বড় মনীষীর কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। হাদীসের উচ্চতর সনদ লাভ করার পর নিজেকে নিয়োজিত করেন দীনি ইলম শিক্ষাদানের মহান ব্রতে। পবিত্র মক্কা শরীফে তাঁর পাঠদান কেন্দ্রটি ছিল জ্ঞানপিপাসুদের

আত্মার ঠিকানা। হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত মনিষী আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন সাবেক সাকালী (রহ.)ও তাঁর শিষ্য ছিলেন। ইতিহাসের বিখ্যাত মনীষী আল্লামা খতীবে বাগদাদী (রহ.) তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে লিখেছেন : আমি হিজরী ৪৬৩ সালে হজের মৌসুমে হযরত কারীমার কাছে বুখারী শরীফ পড়েছি। বর্ণিত আছে, তিনি ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বাইরে মা'রিফাতেরও সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কালের এই মহান শিক্ষিকা হিজরী ৪৬৪ সালে মৃত্যু বরণ করেন। [প্রগুক্ত : ১২৬]

ফখরুন নিসা শাহিদা (রহ.)

হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সুবিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ক্যালীগ্রাফী শিল্পী। আরবী বর্ণমালার শৈল্পিক আঁকা-আঁকি দিয়ে বিদ্যার জগতে প্রবেশ করেন স্বীয় পিতার হাত ধরে। বাবা আবু নাসর আহমাদ ছিলেন ইরানের দায়নূর শহরের অন্যতম বিশিষ্ট আলেম। তিনি আত্মজার জ্ঞানের নেশা ও বিদ্যার প্রতি উত্তাল অনুরাগ দেখে বেশ খুশি হোন। সমকালীন সর্বজনবিদিত মনীষীদের কাছ থেকে ইলম হাসিলের ব্যবস্থা করে দেন। ফলে স্বল্প সময়ে তিনি পবিত্র হাদীসশাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর তা'লিম লাভ করার সুযোগ পান। এবং সমকালীন জ্ঞান-পণ্ডিতগণও তার গভীর যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রতিভার স্বীকৃতি দেন।

তার ইলম ও পান্ডিত্যের কথা ছড়িয়ে পড়তেই দিক-দিগন্ত থেকে ইলম-তৃষ্ণার্ত ছাত্রগন চাতকের মত ছুটে আসতে থাকে। বর্ণিত আছে, তাঁর ক্লাসে সমকালীন অনেক বড় মাশাইখ এবং ইমামগন পর্যন্ত হাজির হতেন হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর সনদ লাভ করার জন্যে। হাদীস শাস্ত্র ব্যতিত তিনি ইতিহাস এবং ভাষা সাহিত্যেও গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কথা ও আলোচনায় ছিল যাদুময়তা। তাঁর এই বহুগুণের সমন্বিত বিকাশ সমকালীন বিজ্ঞানকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। ফলে মানুষ তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরুপ 'ফখরুন নিসা ' তথা 'নারী জাতির অহংকার' উপাধিতে ভূষিত করে। বিয়ের পয়তাল্লিশ বছর পর তার স্বামী মারা যান। তখন পূর্ণ একাগ্রতার সাথে শুধু পাঠদানে মশগুল হয়ে পড়েন। তখন সমকালীন আব্বাসী শাসক খলিফা মুসতাযী বি-আমরিল্লাহ্ [শাসনামল হিজরীঃ ৫৬৬ থেকে ৫৭৫] তার প্রসিদ্ধি ও পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বিশাল জায়গিরদারী দান করেন—যাতে তিনি পূর্ণ নিশ্চিন্তে জ্ঞানের সেবা করতে পারেন।

বিদ্যানুরাগী, জ্ঞানের ভুবনের উজ্জ্বল এই নক্ষত্র সুযোগ পেয়ে যান জ্ঞানের সুরভিকে আরও ব্যপকতার সাথে ছড়িয়ে দেবার। তাই তিনি বিশাল এই জায়গিরদারীর আয় দিয়ে ঐতিহাসিক দাজলা নদীর তীরে এক বিশাল 'বিদ্যা নিকেতন' গড়ে তোলেন। যেখানে শত সহস্র শিক্ষার্থী ইসলামী জ্ঞানের অর্জন চর্চা ও অনুশীলন করার সুযোগ পান। যার পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করতেন হযরত শাহিদা (রহ.) নিজে। জ্ঞানের সাধক, জ্ঞানের ধারক ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক এই মহিয়সী নারী নব্বই বছর বয়সে হিঃ ৫৭৪ সালে এই প্রার্থিব জগতকে বিদায় জানান। চলে যান প্রিয়তম মনিবের সান্নিধ্যে। আল্লামা ইব্‌ন জাওযী (রহ.) বলেছেন, শাহিদা (রহ.) শুধু জ্ঞান তাপস-ই ছিলেন না । ছিলেন সৎকর্মপরায়না সর্বদা ইবাদতগুজার এক আল্লাহওয়ালী-তাপসী। [প্রাগুক্ত: ১২৭ পৃ.]

উলায়্যাহ্ বিনতে হাস্‌সান (রহ.)

দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনা কালের সুবিখ্যাত ইমাম ইসমাঈল ইব্‌ন উলায়্যাহর জননী! প্রথম জীবনে ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর বসরার বনূ শায়বানের দাসী ছিলেন। ইমাম ইসমাঈল (রহ.)এর পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী। সে সুবাদে বসরায় তাঁর যাতায়াত ছিল নিয়মিত। আর এভাবেই কৃতদাসী রুপে কিনে আনেন হযরত উলায়্যাহকে। গুণমুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেন। অতঃপর পূর্ণ কুফা নগরে তাঁর জ্ঞান পান্ডিত্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে। তখন সেকালের জ্ঞানের শহর কুফার অনেক নামী দামী আলেম-ফকীহ পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে এসে ভীড় করতে থাকেন ইসলামী আইন ও ফিকাহ্ বিষয়ে মত বিনিময় করার জন্যে। আল্লামা খতিব বাগদাদী (রহ.) বলেন, ফিকাহ ও হাদীস বিষয়ে পন্ডিত এই বুযুর্গ নারী অবশেষে বসরা ও কুফার জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হোন।

এই তাপসী বুদ্ধিমতি নারীর গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করেন ইমাম ইসমঈল (রহ.) হিজরী ১১০ সালে। জ্ঞান তাপসী এই মহিয়সী তাঁর সন্তানের শিক্ষা-দিক্ষার প্রতিও যত্নবান ছিলেন এক আদর্শময়ী মায়ের মতোই। বর্ণিত আছে, বাল্যবয়সেই তিনি তার পুত্র ইসমাঈলকে সেকালের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আল্লামা আবদুল ওয়ারিছ জাওয়াদী (রহ.) এর খেদমতে নিয়ে যান এবং বলেনঃ এটা আমার পুত্র! একে আপনার খেদমতে রাখুন। যাতে আপনার গুণাবলী সেও অর্জন করতে পারে। এই তো সত্যিকারে মায়ের বৈশিষ্ট্য! পরবর্তীকালে এই কিশোরই ইমামের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোন। গর্বিতা জ্ঞানের আকর জননীর বরকতপূর্ণ নামকে যুক্ত করে ইসমাঈল ইবন উলায়্যাহ নামে জগতময় খ্যাতি লাভ করেন।

ইসমাঈল (রহ.) এর পর তাঁর গর্ভে দ্বিতীয় পুত্র রুবাই এর জন্ম হয়। তিনিও সমকালীন অন্যতম মুহাদ্দিস ও প্রসিদ্ধ আলেম হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। এবং তিনিও ব্যবসায়ী পিতার পরিবর্তে জ্ঞানী মাতার নামে [রুবাই ইব্ন উলায়্যাহ] পরিচিতি হোন। পরবর্তী শত শত বছর পর্যন্ত এ বংশে বিপুল আলেম ফকীহও মুহাদ্দিস জন্ম গ্রহণ করেন। [প্রাগুক্তঃ ১১৮পৃ.]

হযরত ফাতিমা (রা.)

হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত হানাফী ফকীহ হযরত আলাউদ্দীন সামারকান্দী (রহ.) এর ভাগ্যবতী কন্যা। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিকাহ গ্রন্থ 'তোহফাতুল ফোকাহা' হযরত সামারকান্দীর অমর কীর্তি। তদীয় প্রিয়তমা দুলালী হযরত ফাতিমার যোগ্য স্বামী শাইখ আলাউদ্দিন কাসানী (রহ.) তোহফাতুল ফোকাহার ব্যাখ্যা রচনা করেন বাদাইউস সানাঈ নামে। যা আজো হানাফী ফিকাহর আকর গ্রন্থ হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত। বর্ণিত আছে, এই ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনার সময় এর পরিমার্জনা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করতেন হযরত ফাতিমা। এবং যে কোন বিষয়ে প্রদত্ত ফতোয়ায় বাবা কন্যা এবং জামাতার দস্তখত থাকতো। [প্রাগুক্ত]

হাফসা বিনতে সিরীন (রহ.)

বিখ্যাত মনিষী হাদীস ও স্বপ্নব্যাখ্যা শাস্ত্রের ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (রহ.) এর বোন। ভায়ের মত তিনিও ছিলেন বিজ্ঞ আলেমা। মাত্র বার বছর বয়সে অর্থসহ কুরআন শরীফ মুখস্থ করে ফেলেন। তাজবীদ ও কেরাত শাস্ত্রে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। নিশাপুরের বিখ্যাত তাফসীরকার হিসাবে সবাই তাকে স্বরণ করতো। বুযুর্গীও ছিল অনন্য। প্রতি রাত্রে পনের পারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন! [প্রাগুক্ত : ১৩১]

সারকথা, ইমলামী জীবন ব্যবস্থায় নারীর গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ জীবনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ নারী। তাই শিক্ষা-দীক্ষা থেকে শুরু করে রনাঙ্গনের তাপিত অঙ্গন পর্যন্ত সর্বত্রই নারীর বিচরণ লক্ষণীয়। তবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-বিভায়-ব্যক্তিত্ব, মর্যাদাবোধ, পর্দা ও পবিত্রতার সাথে। অতএব, ইসলাম নারীকে যথার্থ মূল্যায়ন করেনি কিংবা উপেক্ষা করেছে, অবহেলা করেছে এই জাতীয় কথা শুধু মূর্খতা নিঃসৃত-ই নয় বরং বিদ্বেষ প্রসূতও।

আপনার সন্তানকে যেভাবে গড়ে তুলবেন

পরিবার যেমন জীবন নির্মাণ ও গঠনের প্রথম পাঠশালা তেমনি 'মা'ও জীবনের প্রথম শিক্ষিকা। আচার-আচরণ, স্বভাব চরিত্র, রুচি ও মানসিকতা থেকে শুরু করে সমাজ-সভ্যতা, আদর্শ সংস্কৃতি পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেরই প্রথম দীক্ষা লাভ করে শিশুরা মায়ের কাছ থেকে। একারণেই এক মনীষী বলেছিলেন ঃ তোমরা আমাকে একজন আদর্শ মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি আদর্শ সমাজ দেব।

শিশুরা দেখতে যেমন ফুলের মত নিষ্পাপ-বিধৌত তাদের ভেতরটাও থাকে তেমনি পবিত্র-আলোকিত। তাদের সামনে যা বলা হয়, সংঘটিত হয় যেসব ঘটনা তা তাদের হৃদয় পাতায় অংকিত হয়ে যায় খুবই সহজে। কারণ, তাদের হৃদয় থাকে পরিষ্কার উন্মুখ ও কিছু জানবার-পাবার প্রত্যাশায় সদা উৎসুক! তাই এই শূন্য পরিচ্ছন্ন হৃদয় আকাশে যা অংকিত অলংকৃত হয় জীবনে তা বিস্মৃত হয় না সহজে। যদি সত্য সুবাসিত সভ্যতার বীজ বপিত হয় এই সোনার ক্ষেতে তাহলে ভবিষ্যতে সোনাই ফলবে তার জীবন সাহারার পথে পথে। পক্ষান্তরে যদি এই উর্বর জমিতে রোপিত হয় অসভ্যতা, অসত্য ও অপসংস্কৃতির বিষদানা তাহলে এই বিষদানার বিষফল জীবনভর ভোগ করতে হবে তাকে, তার চারপাশের সকলকে। তাই নিজেদের স্বার্থে, মানব ও মানবতার স্বার্থেই প্রতিটি শিশুর হৃদয় ও চিন্তাকে উন্নত শিক্ষা, পরিশিলীত আদর্শ ও উত্তম চরিত্রগুণে পরিপূর্ণ আলোকিত, উজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তুলতে হবে এবং সর্ব প্রথম এই দায়িত্ব প্রতিটি মায়ের। কারণ, মায়ের আঁচলই এ বয়সের প্রথম ও সেরা আশ্রয়। ঘুরে-ফিরে এখানে এসেই সে আশ্রয় লয় বারবার, প্রতিবার। তাই প্রতিটি শিশুর সার্বিক গঠন ও নির্মাণের প্রধান দায়িত্ব মায়েরই। বিশেষ করে এই কারণেও, সবচাইতে অকৃত্রিম

ঘনিষ্ঠজন হিসাবে তার দোষ-ত্রুটির বিকাশও বেশি ঘটে মায়ের সামনেই। তাই মায়ের পক্ষেই ওসব ত্রুটি-বিচ্যুতির যথার্থ নিরসন ও পরিশোধন করা সম্ভব।

যেভাবে ভাবতে হবে

প্রতিটি মায়েকে প্রথমেই ভাবতে হবে, তিনি তার সন্তানের শুধু মমতাময়ী জননীই নন। তিনি তার ভবিষ্যত-নির্মাতা শিক্ষিকাও বটে। তাই সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে স্থির করতে হবে তার সন্তানের কাংখিত ভবিষ্যত। অর্থাৎ তার সন্তানকে তিনি আগামী জীবনে কী রূপে দেখতে আগ্রহী। অতঃপর সেইরূপে গড়ে ওঠতে হলে তার জীবনে কি কি গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তাও চিহ্নিত করতে হবে। তারপর শুধুই সোহাগ, নির্ঝঞ্ঝাট, আয়েশপূর্ণ নিশ্ছিদ্র আদরের পরিবর্তে পরিমিত মমতা সোহাগ যত্ন ও আদরের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীগুলোও যাতে তার মধ্যে গড়ে ওঠে সে বিষয়েও সতর্ক সচেষ্ট হতে হবে। এক আরবী কবি বলেছিলেন–

তুমি মুক্তি চাও অথচ সে পথে নেই তোমার চেষ্টা-সাধনা
নৌকাতো ভুলেও শুকনোয় চলে না!

লজ্জাবোধ

আদর্শ জীবন গঠনের এক বুনিয়াদি গুণ হলো লজ্জাবোধ। শাসন ও নিয়ন্ত্রণের চালিকা শক্তি হলো লজ্জাবোধ। যার ভিতর এই আলোর বাঁধনটুকু নেই তাকে শাসনের শেকল দিয়ে বেঁধে কখনোই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আর এ গুণটির গঠন ও নির্মাণের প্রথম পাঠশালা পরিবার। মা যার প্রধান শিক্ষিকা। তাই প্রতিটি মায়ের কর্তব্য হলো, নির্লজ্জ কোন শব্দ যাতে তার কলিজার টুকরা সন্তানের সুকুমার বৃত্তিকে পবিত্র মনন ও অনুভূতিকে কলুষিত করতে না পারে সে দিকে পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখা। সতর্ক সচেষ্ট থাকা, যাতে কোন নির্লজ্জ ঘাতক কর্ম তার আশার প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে না পারে। সেই সাথে কঠোর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে নিজেদেরকে-বড়দেরকে। কারণ, শিশুদের প্রথম গ্রন্থই হলো তার চারপাশ। সে তার সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চারপাশে তাকায় আর যা তার কচি ও অবুঝ মনকে

আলোড়িত করে, আকৃষ্ট করে, পরাজিত করে সে তা পূর্ণ যত্ন ও আগ্রহের সাথে লুফে নেয়। অংকিত ও রোপিত হয়ে যায় তার হৃদয় পাতায়। এই অংকুরে লালিত বিশ্বাসই তাকে বয়সে যৌবনে বার্ধক্যে পরিচালিত করে, নিয়ন্ত্রিত করে।

খানা পিনার আদব

শুরুতেই যে মন্দ স্বভাবটি তাড়া করে ফিরে প্রতিটি অংকুরিত মুকুলিত নিষ্পাপ শিশুকে তাহলো লোভ। পুচকে ইদুর ধরনের এই লোভকে সুস্থ তরবিয়তের মাধ্যমে পরিশিলীত করা না গেলে এক সময় এই লোভই এই শিশুকে জাতীয় গাদ্দার, ধোকাবাজ, ঠক ও ভয়ংকর কুমির কিংবা রাক্ষসে পরিণত করে ছাড়ে। তখন নিকটজন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ পর্যন্ত গ্রাস করতে পরোয়া করে না এরা। এক্ষেত্রে মায়েদের প্রধান কর্তব্য হবে, খাবার মায়েরা নিজ হাতে নিয়ন্ত্রণ করবেন। শিশুকে তার নিজ হাতে খাওয়াতে অভ্যস্ত করবেন। অন্যদের সাথে খেতে দিবেন–আগে নয়। যেন অন্যের খাবারের প্রতি হাত না বাড়ায়– বরং অন্যের মুখে খাবার তুলে দিতে উদ্বুদ্ধ করবেন। অতি খাবারের অনিষ্টতার কথা তাকে বার বার বলতে হবে– যাতে উদরপূজারী মানসিকতার অগ্নি তাকে কখনোই স্পর্শ করতে না পারে। সরল সহজ খাবারে অভ্যস্ত করে তুলবেন। যাতে ভবিষ্যতে সরল-সুন্দর জীবনে অভ্যস্ত হতে পারে।

পোশাক-পরিচ্ছদ

শুরু থেকেই অবৈধ-বিজাতীয়, সভ্যতা বিবর্জিত-কুরুচিপূর্ণ পোশাক পরিচ্ছদ থেকে মুক্ত রাখবেন। এবং ওসব পোশাকে সজ্জিতজনদের ভেতরকার কুৎসিত লোভী ও নোংরা দিকগুলো তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। সেই সাথে ধর্মীয়-দীনী লেবাস-পোশাকের গাম্ভীর্যপূর্ণ শান, সরল-উজ্জ্বল সৌকর্য ও হৃদয় শীতল করা ভাব-মূর্তির কথা তাদের কচি বিশ্বাসের নরোম গতরে সযত্নে এঁকে দিতে হবে– যাতে আজীবন তাদের কচি হৃদয়ের টানেই সে দালাল-টাউটদের পোশাক পরিহার করে ভদ্র ও শালীন সভ্য সুমানুষদের পোষাক পরিচ্ছদে নিজেকে সাজিয়ে রাখে এবং এ জন্যে সদাই লক্ষ্য রাখতে হবে, সে যেন এমন বন্ধুদেরকে কাছে পায় যারা এই সভ্য

পোশাকেরই অনুসারী। সেই সাথে তার বৈধ মনোরঞ্জন ও মনতুষ্টির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে মাকেই। যাতে বৈধ সাজ-সৌন্দর্য ও শিল্পের ছোঁয়ায় তার পরিচ্ছদ থাকে বরং অন্যদের চাইতেও অধিক দীপ্ত-আলোকিত।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এটা একটা মৌলিক বিষয়। শিক্ষার্থী কিংবা আমাদের সন্তানকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বদাই গভীর নজরে লক্ষ্য রাখতে হবে গৃহিতপন্থা তাকে কতটা প্রভাবিত, তৃপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত করছে। এক্ষেত্রে যেমন অতি ছাড়াছাড়ির অবকাশ নেই তেমনি বাড়াবাড়ি এবং কড়াকড়িরও প্রয়োজন নেই। বরং শিশুর বয়স, চাহিদা ও পরিবেশের স্পষ্ট চাহিদা ও পরিবেশের স্পষ্ট ধারাকে বিবেচনায় রেখেই তাকে সুশীল করার ব্যবস্থা নিতে হবে। মধ্যপন্থা-ই হবে যার সরল ঠিকানা।

চাল-চলন, খেলা-ধুলা

স্বাস্থ্য শুধু সুখেরই মূল নয়, জীবন প্রতিষ্ঠার চালিকা শক্তিও। তাই যাতে বদ্ধ অলসতায় শিশুর জীবনকে বরফায়িত করে অকর্মন্যের দুয়ারে নিয়ে দাঁড় করাতে না পারে সেজন্যে রীতিমত কিছু ব্যায়াম, পরিমিত খেলা-ধুলারও সুযোগ দিতে হবে তাদেরকে। সঙ্গে সঙ্গে আলসেমীর ক্ষতি ও কর্মপরায়নতার কল্যানময় দিকগুলোও তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে বয়স মানের ভাষা ও উপস্থাপনায়।

শুরুতেই তাকে বড়-ছোট বলতে যে একটা সামাজিক মৌল ধারা আছে তার সাথেও পরিচিত করে তুলতে হবে তাকে। বড়দের সাথে আচরণ কেমন হবে, বন্ধুদের সাথে হবে কেমন এসব খুঁটি-নাটি বিষয়ও বুঝতে হবে। কথা বলার ধরন, প্রয়োজন ব্যক্ত করা, অপারগতা প্রকাশ করা, পরিচিতজনদের সাথে আচার-আচরণ, অপরিচিতজনদের সাথে কথা বলার রীতিনীতি সম্পর্কেও সজাগ করে তুলতে হবে মায়েকেই। চলার পথে দৃশ্যমান ভালো বিষয়ের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ ও তার উপকারিতা বর্ণনা, মন্দ কিছু নজরে পড়লে মমতার সাথে তার ক্ষতির দিকগুলো সন্তানকে তার মুকুলিত বয়সেই শিক্ষা দেবেন তার মা।

বসবে কিভাবে, হাঁটবে কিভাবে, প্রস্রাব-পায়খানা কিভাবে করবে, কারো সাথে কথা বললে কি চোখের দিকে তাকিয়ে বলবে না আনতদৃষ্টিতে, সবিশেষ বড়দের সামনে বসতে গেলে বসে বসে পা দুলানো যে বেয়াদবী,

কথা বলার সময় আঙ্গুল উচিয়ে চড়াকণ্ঠে কথা বলা যে দৃষ্টিকটু এ কথা শেখাবার দায়িত্বতো মায়েরই।

যথাসম্ভব লুকোচুরির স্বভাব যাতে গড়ে না ওঠে সেদিকে মাকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। এও লক্ষ্য রাখতে হবে, শাসনের মাত্রা যেন তাকে মিথ্যা কিংবা ভান-ভণিতার প্রতি তাড়িত না করে।

গল্প শোনানোর অভ্যাস

গল্পের প্রতি শিশু-কিশোরদের আগ্রহ অসীম। তারা বিশেষ করে মা, ফুফু, দাদী-নানীর কাছে গল্প শোনার বায়না ধরে প্রতি রাতেই এবং গল্পের কাহিনী লিখিত পাঠের চাইতেও অনেক বেশি প্রভাবিত করে তাদেরকে। তাই সন্তানের মনন ও বিশ্বাসকে পরিপুষ্ট করবে, তার চিন্তা ও স্বপ্নকে আলোকিত করবে, তার ভবিষ্যৎ জীবন ও কর্মকে আলোড়িত করবে সেসব গল্প-কাহিনী ইতিহাসের সমুদ্র থেকে নির্বাচিত করে তা যত্নের সাথে তুলে দিতে হবে সন্তানের কানে।

এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বসহ শোনাতে হবে নবীদের কাহিনী। আল্লাহর জন্যে আল্লাহর দীনের জন্যে তাঁদের ত্যাগ ও সাধনার গল্প শুনিয়ে শোধাতে হবে– বাছাধন! বড় হয়ে তোমাকেও চলতে হবে তাঁদেরই পথে। তাদেরকে আরও শোনাতে হবে সাহাবায়ে কেরামের গল্প; বীর শহীদানের গল্প; নিজে না খেয়ে অন্যদেরকে খাওয়ানোর গল্প; অলি-আউলিয়াদের বিস্ময়কর গল্পও শোনাতে হবে এবং সাহস দিতে হবে– 'চাইলে তুমিও হতে পারবে একদিন বিশ্ববিখ্যাত ওলী।'

শুধু জীবন বাঁচানোই নয়, জীবন দানও যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত একথাও তার হৃদয়ে গেঁথে দিতে হবে মাকেই। বড় যত্নের সাথে আল্লাহ ও তাঁর মহান গুণাবলীর কথা শোনাতে হবে– যেন আল্লাহ বিশ্বাসী সুন্দর সুষ্ঠু পরিপক্ক মন নিয়েই পা দিতে পারে সে পরিবারের পাঠশালা পেরিয়ে আনুষ্ঠানিক পাঠশালায়।

একথা পূর্ণ আস্থা দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, কোন মা যদি তার সন্তানকে আনুষ্ঠানিক পাঠশালায় পাঠাবার পূর্বে তার মনন চিন্তা ও হৃদয়কে এসব পবিত্র অনুভূতিতে পূর্ণ করে দেন অতঃপর গভীরভাবে লক্ষ্য রাখেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ তার সন্তানের স্বভাব-চরিত্র, আচরণ,

সভ্যতাকে বিপথগামী করছে কি-না তাহলে তাঁর এই সতর্ক ব্যবস্থা নির্ঘাত তার সন্তানকে সোনার সন্তানে পরিণত করবে; ইতিহাস তাকে স্মরণ করবে স্বর্ণপ্রসবিনী জননী হিসেবেই।

দুঃখ হলো, আজকের মায়েরা শ্রেষ্ঠত্বের এ পথকেই ভুলে গেছে। তারা তাদের ঘরে সোনা ফলাবার সুবর্ণ সুযোগকে পদদলিত করে অন্যের ঘরে গিয়ে সস্তা চাল-ডালের ঘানি টানে। এই দুঃখী দুনিয়ার দুর্দশা ঘুচাতে মায়েদের সন্তানমুখী, ঘরমুখী বিপ্লবের যে বিকল্প নেই– একথা কি বুঝার সময় এখনো হয়নি?

ঘর নারীর আপন ভুবন

বড় একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী বলেছেন, রোগী হাসপাতালে পৌছার অর্থ হলো, সে এখন নিরাপদ। তাই হাসপাতালে পৌঁছে যাবার পর আর তার কোন চিন্তা থাকার কথা নয়। অধিকন্তু তার আত্মীয়-স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও তাকে নিয়ে আর চিন্তা করা উচিত নয়। এখন তাকে নিয়ে ভাববেন চিকিৎসকগণ এবং হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীগণ।

এটা শুধু একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানীর কথাই নয়। সমাজের সুধীজনরাও এমনটি-ই ভাবেন। সজাগ-সচেতন প্রতিটি নাগরিকই মনে করেন, রোগীকে কোন চিকিৎসকের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানীর অভিমত, সমাজের চিন্তাশীল সুধীজনদের এই মত ও বিশ্বাসের প্রতি আমরাও শ্রদ্ধাশীল। তবে কথা হলো, একজন রোগীর প্রতি একজন চিকিৎসকের মমতা, আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতা বেশি– না মহান করুণাময় মমতাময় আল্লাহ তাআলার দয়া, অনুগ্রহ ও কল্যাণ-কামনা অধিক?

এ বিষয়ে বিতর্কে না গিয়ে বরং খুব সামান্য চিন্তা করলেই আমরা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারব, শুধু রোগী নয়, পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি

মহান দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহ যতটা গভীর, শক্ত ও ব্যাপ্ত তা আর অন্য কারও নয়। তাছাড়া 'মমতা' এই গুণের সৃষ্টিকর্তাও তো আল্লাহ। যে কারণে, মানুষের মধ্যে যে মমতা থাকে তাতেও থাকে বিস্তর খাঁদ, অপূর্ণতা, বৈপরিত্ব ও হিতেবিহিত ঘটার সমূহ আশঙ্কা। তাই নিশ্চিত করে সে বলতে পারে না, কল্যাণ কামনার্থে তার চেষ্টা কর্ম ও আয়োজন ফলাফলের বিবেচনায় কতটা সফল ও স্বার্থক হবে।

এই চিকিৎসকের কথাই ধরুন। তিনি জানেন না, তার দেয়া প্রেসক্রিপশন আদতেই কি রোগীকে সুস্থ করে তুলতে পারবে, তার বেদনার উপশম কিংবা যন্ত্রণার ঘা দূর করতে পারবে? তিনি জানেন না। তবুও আমরা বিশ্বাস করি, নিশ্চিত ধরে নিই, ডাক্তারের হাতে যখন পৌঁছেছে, সেবার ঘরে (হাসপাতালে) যখন পৌঁছে গেছে তখন আর ভাবনা নেই। অথচ মহান আল্লাহ'র দয়া, মমতা, অনুগ্রহ, হিতকামনার কোনটিতেই তেমন অপূর্ণতা ও সংকীর্ণতা নেই। নেই তাঁর হিতকামনায় বিহিত হওয়ারও একবিন্দু সম্ভাবনা নেই। অথচ সেই প্রাজ্ঞ দয়াময় করুণানিধি আল্লাহই যখন আমাদের জীবন সমস্যার কোন চিকিৎসা দেন, তখন আমরা আন্তরিক বিশ্বাস, আস্থা ও প্রত্যয়ের সাথে মেনে নিতে পারি না যে, এর মধ্যেই আমার জীবনের পূর্ণকল্যাণ, বিজয় ও সফলতা নির্ভর করছে।

বর্তমান সভ্য পৃথিবীর একটি বড় জিজ্ঞাসা হলো, নারীর অবস্থান কোথায় হবে? ঘরে না বাইরে! সুরক্ষিত অন্দর মহলে না অরক্ষিত শিল্প-ভুবনে, যেখানে আলো-অন্ধকার, ভাল-মন্দ, সভ্য-অসভ্য সবাই এক সাথে গলাগলি করে বসবাস করে। মত উভয় দিকেই আছে। যুক্তি-কুযুক্তির ইয়ত্তা নেই। সুতরাং ওসব যুক্তিতর্কের আর মতলবী ভাষ্যের ঊর্ধ্বে ওঠে এই নারী-পুরুষের সৃষ্টিকর্তা মহান প্রভুর কাছেই তার সমাধান চাওয়া অধিক নিরাপদ ও বিবেকসিদ্ধ। কারণ, যিনি পয়দা করেছেন তিনিই তো জানেন এবং পরিপূর্ণভাবে জানেন, কার অবস্থান কোথায় হবে– অধিকন্তু কার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? এ সুবাদে মহান রাব্বুল আলামীন পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন–

وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى

'তোমরা তোমাদের ঘরেই অবস্থান কর, আর প্রাচীন মূর্খযুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না।' [আহযাব : ৩১]

আলোচ্য আয়াত থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে, আল্লাহ তাআলা চান, নারীরা তাদের বাড়ির ভেতর অবস্থান করুক। কারণ, গৃহকর্ম নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও সম্পাদনের মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যেই তাদের সৃষ্টি। তাই তারা গৃহে, গৃহকর্মে, গৃহসৌন্দর্য নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এই তো কাম্য।

অধিকন্তু এই কারণেই আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে 'আহলে বাইত' ঘরওয়ালী বলে সম্বোধন করেছেন। বলেছেন, স্ত্রীরাই হলো ঘরের মালিক। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী হযরত সারা (রা.) কে আহ্লে বাইত শব্দে স্মরণ করেছেন। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবন-সঙ্গিনী হযরাতে উম্মাহাতুল মু'মিনীনকেও বলেছেন আহলে বাইত। এর অর্থ হলো, নারীরাই ঘরের অভিভাবক ও পরিচালক। ঘরের নিয়ন্ত্রণ, পরিচর্যা ও পরিচালনার দায়িত্ব তাদেরই। এ মর্মে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– 'স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের অভিভাবক।' [বুখারী, হাদীস : ৮৯৩]

এর মর্ম খুবই দ্ব্যর্থহীন। অর্থাৎ নারীর ভুবন হলো সুরক্ষিত সংসার জগত। এই জগতের শান্তি-শৃংখলা, উন্নতি ও সমৃদ্ধির কথা ভাবাই তার কাজ। স্বামী সন্তানের পরিচর্যা ও গৃহকর্মের শিল্পময় অভিভাবকত্বের জন্যেই আগমন তার এই সুন্দর পৃথিবীতে। এই লক্ষ্য ও বাস্তবতা উপলব্ধি করতে যারা সক্ষম হয়েছে, তারাই মূলত সফল, স্বার্থক ও ফলবান জীবনের অধিকারিনী- এই জগতে এবং পরকালেও।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তাআলার এই সুন্দর ফয়সালার আভাময় সত্যকে উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও আলেয়ার ঝলক-দর্শনে তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এই সুরক্ষিত আবাস ঘরকে মনে করেছে পিঞ্জিরা– বন্য পাখিকে বাধ্য করার খাঁচা! তারপর তারা সেই খাঁচা থেকে বের হয়ে আসার জন্যে বন-বাদারে বন্যদের মত ঘুরে বেড়াবার লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে নানা যুদ্ধে। নারী মুক্তি-যুদ্ধই এক্ষেত্রে সবচে' তুঙ্গে। অবশ্য নাম দিয়েছে সেটাকে নারী স্বাধীনতার যুদ্ধ।

আজকাল অনেকেই বলে থাকেন, মেয়েরা সর্বদা বাড়ির ভেতর আবদ্ধ পরিবেশে অবস্থান করলে তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। এ বিষয়ে প্রধান ও মৌলিক যে কথাটি তাহলো প্রথমেই প্রতিটি ঈমানদারকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা যেভাবে সমগ্র

জাহানের মালিক, তেমনি সুস্থতা-অসুস্থতারও তিনিই মালিক। ভিন্ন শব্দে এই নিখিল জগতের সকল কিছু যেভাবে তাঁর নির্দেশের অধীন, তেমনি স্বাস্থ্য, ব্যাধি, শান্তি-সুখ সবই তাঁর নির্দেশের অধীন। সুতরাং আল্লাহ'র বিধানের অনুসরণ করতে গিয়ে কেউ রোগ-ব্যাধির প্রকোপে পড়বে এটা একান্তই হাস্যকর। বরং যারা প্রকৃত অর্থে আল্লাহকে প্রভু হিসেবে বরণ করে নিয়েছে, তাদের স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি সবই নিহিত ওই সুরক্ষিত ঘরের ভেতর- আল্লাহর আইন মান্য করার ভেতর। আর যারা মুখে আল্লাহ স্বীকার করলেও প্রকৃত অর্থে শয়তানকে গ্রহণ করেছে বন্ধুরূপে, বদ্ধ সুরক্ষিত অঞ্চলে তারা নিজেদেরকে আবদ্ধ-আক্রান্ত অসুস্থ ব্যাধিগ্রস্ত পীড়িত মনে করবে এটাই স্বাভাবিক।

কোন নারী যদি আল্লাহ তাআলা'র আদেশ মান্য করে ঘরবাসিনী হয়ে যায় এবং ঘর-দোরের নিয়ন্ত্রণ ও কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে তুলে নেয়, তাহলে তাকে স্বাস্থ্যগত অরজিশ ও ব্যায়ামের জন্যে পথে, প্রান্তরে ক্ষুধার্ত বন্যদের মত ছুটে বেড়াতে হবে না। কারণ ব্যায়ামের লক্ষ্য হলো-

১. শ্বাস দ্রুততর হওয়া,

২. শরীর ঘর্মস্নাত হওয়া এবং

৩. শরীরের পরতে পরতে কর্মক্লান্তি অনুভূত হওয়া।

এ কয়টি পয়েন্টে উত্তীর্ণ হওয়াকেই ব্যায়াম বলে। আজ কথিত সভ্যতার ঝলকে দ্বিধান্বিত নারীজগত স্বীয় কলজে-ছেঁড়া ধন সন্তানের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ভবিষ্যত নির্মাণের স্বার্থে ঘর-সংসারের শ্রম নিবেদনকে বোঝা মনে করে। অথচ তাকে একদিকে যেমন সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নির্দেশ মান্য করার ফলে তার পরকাল সফল হয়ে ওঠে, তেমনি তার যত্নভরা নিয়ন্ত্রণের ফলে সুন্দর সবল ভবিষ্যত নিয়ে গড়ে ওঠে তার আগামী দিনের স্বপ্ন ও ভরসা হৃদয়ের ধন সন্তানেরা। সেই সাথে তার শরীর, স্বাস্থ্য, মন চিন্তাও থাকে সবল, পূতঃপবিত্র। মূলত আজকের এই আধুনিক পৃথিবীও সেই স্বাস্থ্যবতী কর্মপ্রেমী সংসারপ্রিয় নারীদের দিকেই তাকিয়ে আছে- যাদের হাতে গড়া সন্তানেরা অশান্ত যুদ্ধমুখর এই পতিত পৃথিবীকে শোনাবে নতুন স্বপ্নের কথা, কল্যাণময় সৃষ্টি ও বিপ্লবের কথা। আর সেই চিকিৎসাবিজ্ঞানীর ভাষ্যমতে নারীও যেন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তার আপন ভুবনে এসে পায় পূর্ণ নিরাপত্তা, যেখানে তার জীবন, সম্ভ্রম, ব্যক্তিত্ব ও স্বপ্ন নিয়ে তাকে ভুগতে হবে না কোন সংশয়ে। নিশ্চয়ই ঘরই নারীর ভুবন, নিরাপদ ইলাহী আশ্রয়।

মোহর : নারীর প্রতিষ্ঠিত অধিকার

ইসলাম হলো মানব ও মানবাধিকারের ধর্ম। মানবমণ্ডলীর জীবনব্যাপী সুখ শান্তি নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করত: উভয় জাহানের বিজয় ও সফলতার প্রত্যয়পূর্ণ দিক নির্দেশনার লক্ষ্যেই ইসলামের আবির্ভাব। মহান এই লক্ষ্য অর্জনে ইসলামের বিধি-নিষেধ যেমন স্পষ্ট তেমনি এখানে ধনী গরীব সাদা-কালো ও নারী-পুরুষের বিভাজনও অর্থহীন।

মানব জীবনে ইসলাম নারীর জন্যে যেসব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো 'মোহর'। মোহর নারীর অকাট্য অধিকার। তাই যে কোন পুরুষ কোন নারীকে বিয়ে করতে হলে তাকে অবশ্যই মোহর দিতে হবে। অন্যথায় স্ত্রীর কাছে সে ঋণী থেকে যাবে। কিন্তু আজ আমাদের সমাজে ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকার কারণে এই মোহর নিয়ে অবহেলা, অবজ্ঞা ও প্রহসনের যেন কোন শেষ নেই। এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তারা মনে করে, মোহর একান্তই একটি রেওয়াজী ও আনুষ্ঠানিক বিষয়। বিয়ে সম্পাদন কালে ওটা বলতে হয়। ওই পর্যন্তই শেষ। আবার অতি সচেতন বলতে একটা শ্রেণী আছে, তারা মনে করে, মোহরটা হলো একটা কঠিন অস্ত্র। কোন কারণে ছেলের সাথে মেয়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে তখন এই অস্ত্র কাজে লাগাতে হয়। এর পূর্বে এর কোন বিশেষ অর্থ নেই। আর এই কারণেই এই শ্রেণীর লোকেরা মোটা অংকের মোহর আঁটতে ব্যস্ত থাকে সর্বদা। পক্ষান্তরে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচিত একটি শ্রেণী আছে, তারা মোহর আদায় অনিবার্য মানে ও বিশ্বাস করে বটে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এমন হাস্যকর ছোট অংকের মোহর বাঁধে– যা থেকে শরীয়ত সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট অজ্ঞতা বুঝে ওঠতে মোটেও কষ্ট হয় না। তাই প্রথমেই আমাদেরকে বুঝতে হবে, ইসলাম পুরুষ তথা স্বামীর উপর মোহর আরোপ করেছে কেন!

মোহরের মূল তত্ত্ব ও মর্ম

এক. বিয়ে হলো একটি বন্ধন। মানবিক জীবনের পূর্ণতার পথ বিয়ে। পূর্ণতার পথের এ বন্ধন নির্মাণের ক্ষেত্রে ইসলাম পুরুষের উপর 'মোহর' অভিধায় কিছু 'অর্থদণ্ড' অবশ্য কর্তব্য বলে স্থির করে দিয়েছে। যার অর্থ হলো, জীবনের পূর্ণতা বিকাশের এই অনিবার্য বন্ধন নির্মাণের ক্ষেত্রে নারী প্রার্থী ও তালিব নয়। বরং প্রার্থী হলো পুরুষ আর নারী হলো প্রার্থনীয়। নারী হলো মাত্‌লূব। তাই পুরুষকেই অর্থদণ্ড দিয়ে হলেও জীবনের পূর্ণতা অর্জনের স্বার্থে নারীকে গ্রহণ করতে হবে, নারীর বন্ধন প্রার্থনা করতে হবে।

দুই. নর ও নারীর বন্ধনে প্রতিষ্ঠিত এই দাম্পত্য সফরে তারা একে অপরের বন্ধু সঙ্গী সহযোগী ও সহযোদ্ধা। তাই তাদের এই নতুন জীবন ও নতুন সফরের প্রতিটি মুহূর্তে প্রয়োজন হয় পারস্পরিক হৃদ্যতা, মমতা, প্রেম, আকর্ষণ ও সহযোগিতা। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টিগত ও কুদরতীভাবেই নারী পুরুষের চাইতে দুর্বল– তাই জীবন পথের বাঁকে বাঁকে নারীকে ভরসা করতে হয় পুরুষের উপর। সেক্ষেত্রে পুরুষকে বরণ করতে হয় ত্যাগ, স্ত্রীর মন ও প্রয়োজন প্রতিষ্ঠায় জলাঞ্জলি দিতে হয় নিজের সুখ ও সাধ। ভবিষ্যতে এ পরীক্ষায় টিকে থাকতে হলে বিজয়ী হতে হলে তার প্রধান সম্বল হলো স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহবোধ। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক মনিষী শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) বলেছেন : মোহরের মাধ্যমে অনিবার্য সেই আকর্ষণ ও আগ্রহবোধকেই মেপে দেখা হয়। এই মাপে যদি সে উত্তীর্ণ হয় তবেই সে যোগ্য বর বলে বিবেচিত হবে। তাই মোহরের পরিমাণ হতে হয় স্বামীর সামর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ– যাতে এই নারীর প্রতি তার আকর্ষণ ও আবেদনের মর্ম নিঃশব্দে ফুটে ওঠে। বলার অপেক্ষা রাখে না, দায়সারা গোছের সংক্ষিপ্ত অংকে সে কথার অভিব্যক্তি মোটেও ঘটে না!

তিন. গেল শতাব্দীর সুবিখ্যাত মুজতাহিদ হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন পুরুষের উপর মোহর হিসাবে কিছু অর্থ অনিবার্য করে দেয়া হয়েছে এই জন্যে– যাতে বিয়ের পূর্বেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই কনের প্রতি বরের আকর্ষণ কতটুকু। কারণ, পরস্পরের আকর্ষণ ও আগ্রহ না থাকলে সংসার জীবন যেমন সুখময় হয় না তেমনি স্থায়ীও হয় না। আর এই আকর্ষণ মাপার সবচাইতে নিখুঁত যন্ত্র হলো 'অর্থ-বিত্ত'। কারণ, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অর্থের প্রতি দুর্বল। অর্থ ও পার্থিবতাকে সে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিতে

অভ্যস্ত। তাই ওই অর্থ বিত্তকে বিসর্জন দিয়েই তাকে প্রমাণ দিতে আদেশ করা হয়েছে সে এই নারীর প্রতি কি সত্যিই আকর্ষণ বোধ করে?

মোহর হলো স্ত্রীর জন্যে সম্মাননা। (Honorarium) স্বরূপ। এর অর্থ স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এটা আদৌ কোন বিনিময় কিংবা মূল্য নয় যে, এর দ্বারা স্ত্রী স্বামীর দাসী বা সেবিকা হয়ে যায়। বরং এর দ্বারা একথাই বিকশিত হয়, নারীসত্তা এক মহান সম্মানিত রূপ। যার স্পর্শে আসতে হলে 'দন্ড' কবুল করেই আসতে হয়। আর যেহেতু এটা নারীর সম্মানে প্রদত্ত হয় তাই তার পরিমাণও হতে হয় সম্মানপূর্ণ। অবশ্য সেই সাথে স্বামীর সামর্থের বিষয়টিও অবশ্যই বিবেচ্য এবং গ্রহণযোগ্য। আলোচিত এই তত্ত্বাবলীর আলোকে যেমন নিবন্ধের প্রারম্ভে উল্লিখিত মানসিকতা সমূহের অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে– সেই সাথে এই ধারনারও মূলোৎপাটন হয়ে যায় যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয়তমা নন্দিনী হযরত ফাতিমাতুয-যাহরা (রা.) কে হযরত আলী মুরতাযা (রা.) যে মোহর দিয়েছিলেন ওটাই প্রকৃত ইসলামী মোহর। কারণ, মোহরটি হলো প্রতিটি নারীর স্বতন্ত্র অধিকার। তাই এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বর ও কনের নিজস্ব উপস্থিত সামর্থ ও অবস্থা-ই বিবেচ্য। হ্যাঁ, কেউ যদি স্ত্রীর রিযা ও সন্তুষ্টি সাপেক্ষে একান্ত বরকতের উদ্দেশ্যে ফাতিমী মোহর আদায় করে সেটা ভিন্ন কথা!

সারকথা হলো, মোহর নারীর প্রতিষ্ঠিত অলংঘনীয় অধিকার। এর লক্ষ্য, নারী যে সম্মানিত, নারী যে প্রার্থনীয় এবং জীবনের পূর্ণতা বিধানের ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি যে অনিবার্য সেকথা-ই বলিষ্ঠ উচ্চারণে ফুটিয়ে তোলা! তাই মোহর আদায় কালে যেমন অনুদান প্রদানের মতো ছোট ও পতিত ভাবনার অবকাশ নেই– তেমনি প্রতিষ্ঠিত এই অধিকার আদায়ে কোনরুপ কৌশলপূর্ণ শৈথিল্য কিংবা স্ফীত অংকের মোহর বেঁধে প্রতাড়না করারও অবকাশ নেই! বরং আলোকিত এই নির্দেশের মাধ্যমে মাতৃজাতি নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা বাস্তবে রুপায়নের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রকৃত মুমিন হিসাবে গড়ে তোলা-ই হবে সচেতন ঈমান ও বিশ্বাসের দাবি।

তালাক : নারী স্বাধীনতার সনদ

মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে পূর্ণতা বিধান, মানব বোধ ও চাহিদার সযত্ন লালন ও সংরক্ষন পবিত্র ইসলামের অন্যতম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। তাই সুস্থ মানবিক আবেদন ও যৌন সৌন্দর্যকে পবিত্র-বিধৌতরুপে লালন ও সংরক্ষনের জন্য আয়োজন করেছে বিয়ের। মানুষের স্বভাবজাত কাম-প্রত্যাশাকে স্বকীয় বিভায় ফলবান করে তোলার এ এক স্বাধীন ও নিরাপদ ব্যবস্থা। সেই সাথে রিপু ও কাম প্রবনতাকে পাশবিক জঙ্গীপনা থেকে মুক্ত করে মানবিক মর্যাদাপূর্ণ অভিধায় মন্ডিত করার স্বার্থক প্রয়াস এই বিয়ে প্রথা। এ অর্থে বিয়ে যেমন জীবন পূর্ণিমার পথে যাত্রা, তেমনি বিয়ে মানব মনে লুকিয়ে থাকা, কাম-রিপুর পরতে পরতে সদা জাগ্রত শত পাশবিক নিলর্জ্জ আবেদনকে পরাজিত করে পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যপুর্ণ মর্যাদাবান সম্মানিত মানব হয়ে ওঠারও এক সক্রিয় সাধনা।

দুটো মন, দুটো স্বপ্ন, দুটো জীবন ধারার এক মধুময় ও অর্থ-বোধক মিলনের নামই বিয়ে। সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি থেকে প্রত্যাশার স্বপ্নাঙ্গনে একে অপরের মাঝে বিলীন কিংবা একাকার হয়ে যাওয়াই যার পরিপূর্ণরুপ।

আমি আর তুমি সেতো একই জন,
আমি তনু, তুমি প্রাণ!
কে বলিবে অতঃপর,
কভু ছিল বিভাজন?

কিন্তু এই সরব পৃথিবীর অবিরাম বাস্তবতা নিয়তই প্রমাণ করে চলছে, স্বপ্ন-সুখের এই আলোক ভুবনে প্রত্যাশার শ্বেত কপোতেরা বার বার আহত হয়, রক্তাক্ত হয়, বেজে ওঠে বেদনার সানাই। স্বপ্ন সোনার ফসল ফলায়

আবার স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়। বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ দুটি প্রাণ প্রানময়তার শত আয়োজনে মাটির পাটাতনে গড়ে তোলে স্বর্গের ঠিকানা। যা দেখে ঈর্ষা ও হিংসায় পোড়ে ছাই হয় কত আযাযীল। অথচ কুদরতের অপার ইচ্ছায় এই স্বজন-স্বজনীই অবতীর্ন হয় পরস্পর দূরত্ব, মন ও চাহিদার বিরোধ, স্বভাব ও চিন্তার বৈপরিত্বের ফলে মহা সংঘাতে। তখন ভালোবাসার সুবাসিত ঠিকানার এক একটি ইট ভেঙ্গে পড়ে ক্রমে কখনো সশব্দে, কখনো নিঃশব্দে। ঠিকানা ভাঙ্গার এই কঠিন বাস্তবতার নামই তালাক। মানব জীবনে এ এক অনিবার্য অনুষঙ্গ।

ইসলামের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, মানব জীবনের প্রতিটি সমস্যাকেই ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বসহ দেখে এবং শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ সমাধান পেশ করে। আর একথাতো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানা কারণেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়, বিরোধ বাধে, ঝগড়া-ঝাটি হয় কিংবা তা মন কষাকষি পর্যন্ত গিয়েই আটকে থাকে। অতঃপর সমস্যার উৎস অনুপাতে তার সমাধানও নেমে আসে বারবার। কখনো বা মনের আবেদনের টানেই মান অভিমানের গ্রন্থি খুলে যায়, কিংবা কথা কাটা-কাটি হয়ে ঝরে পড়ে মনের তাপ-অনুতাপ। অতঃপর শান্ত উভয় পক্ষ। আবার কখনো ক্ষোভ অসন্তোষ হৃদয়ের আকাশে এমন কঠিন ও জমাট মেঘের সৃষ্টি করে বাক-বিতন্ডার কিংবা চেষ্টা চরিত্রের উষ্ণ বায়ু তাকে গলাতে অক্ষম হয়। তখন প্রয়োজন দেখা দেয় তৃতীয় পক্ষের সালিসীর। এ মর্মে ইসলাম বলেছে :

"আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতেই তারা বাধ্য-অনুগত হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ। যদি তোমরা তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশংকা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে আপোষ-রফা সৃষ্টি করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছু অবহিত।" [সূরা নিসা : ৪ : ৩৪-৩৫]

জীবন-সংসারে মান-অভিমান, ভুল- বুঝা বুঝি, শোক-ক্ষোভ একান্ত স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু এই দুষ্টভাব ক্রিয়া-অনুভব যাতে সুখের ও স্বপ্নের নিবাসকে ভেঙ্গে খান খান করে না দেয় সে জন্যে মহামহিম প্রভু এই ক্ষুদ্র

পগার পারের নীতি পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন বক্ষ্যমান আয়াত দুটিতে। এবং এই সমস্যা উত্তরণের দায়িত্ব দিয়েছেন স্বামীকে, স্ত্রীকে নয়। কারণ নারী-পুরুষের সৃষ্টিকর্তাতো সৃষ্টির অনন্তকাল পূর্ব থেকেই জানেন, বিবেক-বুদ্ধি, মেধা-চিন্তা, বিচার-বিবেচনা, বর্তমান-ভবিষ্যত এবং কল্যাণ অকল্যাণের ভিত্তিতে জীবন পথের সমস্যাবলী নিরসনের সংকটকালে সিদ্ধান্ত নির্মাণের যথার্থ ক্ষমতা পুরুষের মধ্যেই আছে, নারীর মধ্যে নয়। অবশ্য কাল-মহাকালের সাগর সাগর অভিজ্ঞতার আলোকে এখন সুস্থ বিবেকবান ও বিবেচকরাও বলছে, জীবন সংসারের হাল ধরা পুরুষকেই মানায়, নারীকে নয়।

এ কারণেই কোন অশুভ আঘাতে আক্রান্ত দাম্পত্যিক ঠিকানাকে পুরো যত্নের সাথে ধরে রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পুরুষকেই। আল্লাহ্ তাআলা পুরুষকেই বলেছেনঃ যদি জীবন সঙ্গিনীর মধ্যে এমন অশুভ কোন কর্ম আচরণ কিংবা সভ্যতার রুপ তুমি দেখতে পাও যা তোমাদের স্বপ্নের নিবাসকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিবে তাহলে তাকে সুপথে, শুভ-স্বপ্নের পথে তুলে আনার দায়িত্ব তোমার-ই এবং তা এই ভাবে–

এক. তোমাকে অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে, নারী কোমলমতি, নারীর হৃদয় ছুঁয়েই পুস্পের কোমলতা আজো কোমল-কান্তি-তে ভরে তুলে কত কঠিন প্রাণ নর-নারীকে। সুতরাং ওই নারীকে শোধরাতে হলে তোমাকে এগোতে হবে এই কোমল কান্ত পথেই। নরোম কোমল প্রেমব্যাঞ্জনায় আমোদিত হৃদয়জাত কথকথার মাধ্যমেই তাকে বোঝাতে হবে তার স্খলন, অঘটন ও অপরাধের কথা। মমতার মায়াডোরে, উত্তম-কোমল চেষ্টা-চরিত্রের মাধ্যমে কাংখিত সুখের আশ্রয়ে তুলে আনতে সচেষ্ট হবে স্বামী নিজে।

দুই. যদি কথার হৃদ্যতা, চেষ্টা-চরিত্রের কোমলতায় বোধোদয় না হয় তাহলে তাকে সজাগ করার প্রয়াস চালাতে হবে বিন্দু বিন্দু বিচ্ছেদ আর কুসুম কুসুম বেদনার আঘাতে । তাকে নিজ ঘরে রেখেই শুইতে দেয়া হবে আলাদা শয্যায়। সাবধান! বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না। তরিৎপ্রিয় নারী সাময়িক কষ্টের পীড়নে আবার বড় কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলে তারই বা নিশ্চয়তা কি? সুতরাং পাশে রেখেই বিচ্ছেদ, প্রেম মমতার পরশ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত করে ক্ষোভের-জেদের হালকা আবরণে আচ্ছাদিত ঘুমন্ত কিংবা অভিমানী ভালোবাসাটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সে ভালোবাসাই মূলত স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সমন্বিত একই ধারায় পথ চলার মূল প্রেরণা ও পাথেয়।

তিন. যদি এতেও হৃদয় মরুতে বসন্তের বায়ু না বয়, চেতনায় না জ্বলে প্রেমের দীপ-অমলিন, তাহলে সেই পাথর কঠিন হৃদয়টাকে একটু শক্ত হাতেই বশে আনার চেষ্টা করতে হবে। আর সেটা হলো কল্যাণকামী প্রহার –দাস-দাসী কিংবা চোর- ডাকাতকে প্রহার করার মত কোন কঠিন মার ধর নয়। ইসলামী আইনে পরিস্কার করে বলে দেয়া আছে, চেহারা বা এই জাতিয় কোন দর্শনীয় অঙ্গে মারতে পারবে না। শরীরে দাগ বসে পড়ে এমন শক্ত ধরণের কোন আঘাতও করতে পারবে না। বরং সন্তানের কল্যাণকামী মা বাবা কিংবা ছাত্রের শুভাকাংখী শিক্ষকের মতোই কোমল সভ্য শালীন হবে সে মার ধর এবং আদর্শবান সভ্য সুশীল কোন নারীর জন্য অতটুকুই অ-নে-ক।

যদি এই তিন স্তরের সাধনায়ও বরফ না গলে, বরং সমস্যা আরো গভীরে বাসা বেঁধে বসে তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষের অভিবাবকরা বসে সম্মানজনক পথে তার সমাধান করতে সচেষ্ট হবে। উভয় পক্ষই বসবে। বসবে নির্মাণের জন্যে, ভাঙ্গার জন্যে নয়। বসবে সমস্যাকে ছোট ও শান্ত করার জন্যে, হৈ চৈ করে বড় ও অশান্ত করার জন্যে নয়। আল্লাহ বলেছেন : যদি তারা ইসলাহ ও সংশোধনের মন নিয়ে চেষ্টা করে তাহলে তিনি তাদেরকে সেই তাওফীক-ই দিবেন।

প্রিয় পাঠক!

মানব সংসার, দাম্পত্য আয়োজন ও মানব-মানবীর কৃত বন্ধনকে লালন রক্ষা ও দীর্ঘজীবী করার যে প্রেসক্রিপসন উপরোক্ত আয়াত দুটিতে প্রদত্ত হয়েছে, অধিকন্তু মানব মর্যাদা সামাজিক সম্মান ও পরস্পর সম্পর্কের ধারাকে যে গুরুত্ব ও তাৎপর্যের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে –একি মানব জীবনের প্রতি পবিত্র ইসলামের অসীম যত্ন ও কল্যাণকামিতার স্পষ্ট প্রমাণ নয়? এতে কি একথা খুবই পরিস্কারভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে না, ইসলাম নির্মাণ চায় পতন চায় না। ইসলাম মিলন চায় বিয়োগ চায় না। ইসলাম গড়তে চায় ভাঙ্গতে চায় না। অধিকন্তু ইসলাম চায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানব জাতির জাগতিক ও পারলৌকিক মর্যাদা ও সম্মানকে অক্ষুন্ন রাখতে। বরং সম্মান গৌরব ও মহত্বের আরো উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ইসলাম। কিন্তু কথা হলো, সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ এই চেষ্টা সাধানায়ও যদি নারী ফিরে না আসে কাংখিত আশ্রয়ে; বরং ক্ষত যদি এতই গভীরে পৌছে গিয়ে থাকে যা ওই কোমল আহবান, নরোম-কুসুম বিচ্ছেদ আর কল্যাণভেজা শাসনে সেরে ওঠবার মত নয়। বরং বিষে বিষে বিষাক্ত হয়ে ওঠেছে তনু-

মন। ঘৃনা ও ক্ষোভে হিংস্র হয়ে ওঠেছে চিন্তা-অনুভব। একে অপরের উপস্থিতি-অস্তিত্বই সহ্য করতে অক্ষম। তারপরও কি তাদেরকে বাধ্য করা যাবে একই আলয়ে একই ঠিকানায় জীবন যাপন করতে! তাহলে সেটা কি খোয়ারে গরু বাধার মত অকথ্য হয়ে যাবে না? কিংবা কারাগারে বন্দী করে রাখার মত.....

অথচ তারা কেউ দাস কিংবা দাসী নয়। আর বন্ধনটাও বেদনা, ক্ষোভ আর ঘৃনার জন্য ছিলনা। ছিল এই জন্যে– প্রাণময়তার অপার স্পন্দনে হেসে-খেলে, সুখ-দুঃখের বিচিত্র দোলায় বসে আহলাদে সভ্য সুন্দর আদর্শ মানব প্রজন্মের অকৃত্রিম কর্তব্য পালনে সদা সচেষ্ট থাকবে তারা। সুতরাং মানবসমাজ ও সভ্যতা নির্মাণ প্রতিষ্ঠা ও পরিচর্যার যে মহান লক্ষ্যে ছিল এই যৌথ ও সম্মানিত জীবনের আয়োজন তা যখন এখন সমাজ সভ্যতার পতন ধ্বংস ও ক্ষয়ের পথে প্রবাহিত হচ্ছে তখন এই বন্ধনকে ভেঙ্গে দিয়ে মানব সমাজ-সভ্যতা ও সরলধারায় প্রবাহিত কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে রক্ষা কি একান্ত অনিবার্য ও পুরো মানব গোষ্ঠির প্রতি অনন্য অনুগ্রহ নয়? বলাবহুল্য, বিশাল ও বিস্তির্ণ এই প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এবং সামগ্রিক মানবকল্যাণের বিচারেই ইসলাম তালাক প্রথাকে অনুমোদন করেছে– শুধুই অনুমোদন! উৎসাহিত নয়।

কথাটা আমরা এভাবেও বলতে পারি, একজন নর ও একজন নারী আকাশ আকাশ স্বপ্ন ও ভালোবাসা নিয়ে এক সময় যে মালা কণ্ঠে ধারণ করেছিল অসীম সুখ ও সুউচ্চ ভবিষ্যতের আশায় এক সময় সেই মালাই পরিণত হয়েছে ফাসির রশিতে কিংবা বলুন কারাগারের শেকলে। অতঃপর অপার কামনা ও প্রত্যাশার সজ্জিত বাসর-ই এখন তার আগুনের কারাগার। এ কারাগারে অবিরাম জ্বলছে সুখ-সপ্নে মিলিত দুটি আদম সন্তান এবং এই কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ তালাক। সুতরাং তালাক শুধু বিচ্ছেদ-ই নয়, তালাক স্বাধীনতার পয়গামও। তালাক মুক্তির মহাবারতা।

অথবা এভাবে বলুন,প্রতিটি মানুষের স্বভাবের ভিন্নতা,স্বপ্ন ও চাহিদার স্বাতন্ত্র মহান আল্লাহর অপার সৃষ্টি-কলার-ই অনুপম বিকাশ। অতএব পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বভাব চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতির মিল ও সামঞ্জস্যতার প্রতি পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয়ার পরও বন্ধন প্রতিষ্ঠার পর তা ভুল প্রমাণিত হতে পারে । প্রমাণিত হতে পারে এ দুয়ের মাঝে জোযন জোযন দূরত্ব। অতঃপর নিয়মিত কথা কাটাকাটি, বাক বিতন্ডা, বিবাদ-বিসম্বাদ কখনো বা রক্তারক্তি।

ইসলাম বড় দরদের সাথে নারীর সারল্য, চিন্তার অদূরদর্শিতা আবেগের উচ্ছ্বাস-প্রবণতা ও সিদ্ধান্তের অপরিপক্কতার কথা বলে স্বামীকে উৎসাহিত করেছে তাকে ছাড় দিয়ে চলতে, দুর্দন্ড প্রতাপে নয়, প্রেমের শাসনে আগলে রাখতে। আর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যের কঠিন ফিরিস্তি তার ভরন পোষন স্বপ্ন পূরনের খাতিরে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির কথা বলে স্ত্রীকে ডেকেছে স্বামীর প্রতি যত্নবান, অনুগত ও দায়িত্ববান হতে। বলেছে, এই বন্ধনের প্রতিষ্ঠা-ই হয়েছে ধরে রাখার জন্যে। সুতরাং কর সাধনা । ভেঙ্গো না বাঁধন।

আর তারা বলছে, উভয়ে বলছে : আর যে পারি না! স্বভাবের দ্বন্দ্ব। রুচির যুদ্ধ। চাহিদার লড়াই! দুই মেরুতে দু'জন– থাকি একই বিছানায়। এভাবে একজন অপরজনের জন্যে আযাব হয়ে না থেকে আলাদা হয়ে উভয়েই সুখি হতে চাই। স্বাধীন হয়ে যে মানুষের জন্ম, অতঃপর জন্মগত কামনার স্বাধীন ভোগ ও চর্চার জন্যে যে বিয়ের আয়োজন তাই যখন পরাধীনতার জিঞ্জির তখনই ইসলাম বলেছে : সাধনাই ভালো ছিলো। সাধনাতেই সোনা ফলে। সাধনার আগুনে পোড়েই মানুষ খাঁটি সোনা হয়। কিন্তু যদি না পার সে পথে চলতে তাহলে কি আর করা যাবে। পেছনে স্বাধীনতার একটি পথ আছে। তবে তা নিন্দনীয়। বুগ্য ও ঘৃনার সে পথ দিয়ে তুমি বেরিয়ে আসতে পার। তবে সে পথ ভাঙ্গার, গড়ার নয়।

মানুষ দুনিয়াতে এসেছে সৃষ্টির জন্যে, ধ্বংসের জন্যে নয়। গড়াই তার কাজ পতন তার শান নয়। জীবন ভাঙ্গার এ পথে তাই ইসলাম যারপরনাই চেষ্টা করেছে পতন ঠেকাতে, ভাঙ্গন রোধ করতে। তাই চূড়ান্ত অসহায়ত্বের ক্ষেত্রে তালাক যদি দিতেই হয় ইসলাম তার জন্যে এমন কিছু নীতিমালা রেখেছে যা মেনে চলতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে দাঁড়িয়ে যেতে হয়, বোধদোয় ঘটে।

ইসলাম বলেছে, একান্ত যদি পরস্পরে বনিবনা নাই হয় তাহলে এমন নারীকে ঘরে রেখে ঘরকে হাবিয়া দোযখ বানাবার প্রয়োজন নেই। তালাক দিয়ে দাও। তবে এক তালাক। অতঃপর তিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা কর। দেখ, তার স্বভাব চিন্তা ও মানসিকতায় পরিশুদ্ধি আসে কি-না। অবশ্য এই নাতি-দীর্ঘ বিচ্ছেদের ফলে-বিয়োগ বিরহের কিঞ্চিত তিক্ততা যন্ত্রনাও অনুভূত হবে। এবং এতেও যদি বোধদোয় ঘটে তাহলে তাকে ঘরে তুলে আনতেও কোন সমস্যা নেই।

কিন্তু যদি শয়তানী ধোকা ও রিপুর কুমন্ত্রনায় এতটা কঠিন হয় যে, ফিরে আসা সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে মেয়াদ পার হবার পর দ্বিতীয় তালাকের দিকে এগোবে। এতেও যদি টনক না নড়ে, তাহলে শরীয়ত বলেছে এবার তৃতীয় তালাক দাও। যার পরে আর এই নারীকে সরাসরি ঘরে তোলার অবকাশ নেই।

বলাবহুল্য, তালাকের ধারাবাহিকতায় এত দীর্ঘ সময় শরীয়ত এ জন্যেই নির্ধারণ করেছে যাতে বারবার সুযোগ পায় উভয় পক্ষ। মিলনের পর ছোট ছোট বিচ্ছেদের ফলে যাতে আগামী দিনের দীর্ঘ বিরহের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করে তারপরই সিদ্ধান্ত নেয়। এবং এও যাতে বুঝে নেয়, যদি তৃতীয় তালাকের তীরটিও হাত থেকে ছুটে যায় তাহলে এই নারীকে পূণরায় প্রত্যাশা করা হবে অসম্ভব। কারণ, তাকে প্রকাশ্যে বিয়ে দিতে হবে কোন সামর্থবান পুরুষের কাছে। অতঃপর তার সাথে এই নারীর শারিরীক মিলন হতে হবে। এবং দ্বিতীয় স্বামী চাইলে তাকে আমরনের জন্যে রেখেও দিতে পারে, আবার বনি-বনা না হলে ছেড়েও দিতে পারে। তবে তা সম্পূর্নই অনিশ্চিত। অতএব তৃতীয় তালাকের পর পূণঃমিলনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত একথা ভাববার ও যথাযথভাবে উপলব্ধি করবার জন্যেই ইসলাম তিনটি মাসিকের ব্যবধানে এক একটি তালাকের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই সময়টাতেও স্বজনদের সাথে মিশবে। একাকীত্বের স্বাদ অনুভব করবে। নীরবে-নিভৃতে পরস্পরের ভাল-মন্দ দোষ গুণের কথা স্বরণ করবে, ভাববে অসহায় সন্তানদের কথা। এবং জীবনের চূড়ান্ত কথা হিসাবেই তৃতীয় তালাকের সিদ্ধান্ত নেবে। অতঃপর তীর হাত থেকে ছুটে যাওয়ার পর আর ভেবে কি লাভ?

দুষ্টজনরা বলে, নিজের বউকে-বিশেষ করে সে যখন কয়েক সন্তানের জননী তখন তাকে আরেক পুরুষের ঘর করিয়ে আনা কি কোন যুক্তি ও সভ্যতা হলো? আরও বলে, তাছাড়া ছাড়াছাড়িটাতো হয়েছে রাগের মাথায়! আর রাগ করে তো মানুষ কত কথা-ই বলে। তখন কি মাথা ঠিক থাকে? প্রথমেই বলি, সখ করে ঠান্ডা মাথায় কে কবে কোথায় তালাক দিয়েছিল শুনি! আর পবিত্র ইসলামের এত স্পষ্ট প্রেসক্রিপশন, উপদেশ ও ধীর রীতির বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে গায়ের জোরে আল্লাহর বিধানকে পদদলিত করাই বা কোন যুক্তি, কোন সভ্যতা হলো? মূলত শরীয়তের দর্শন হলো, বিয়েটা প্রথমত আল্লাহর একটি নেয়ামত। দ্বিতীয়ত বিয়েটা শরীয়ত প্রবর্তন করেছে একটি বলবান স্থায়ী বন্ধন হিসাবে। তাই প্রথমত এই বন্ধনকে ভেঙ্গে দিলে আল্লাহর

নেয়ামতের অবমাননা হয়। দ্বিতীয়ত যে বিয়ের দ্বারা জৈবিক চাহিদা পূরনের ক্ষেত্রে মানুষ পশুর মধ্যে স্বাতন্ত্র ও বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার দ্বারা মানব ও মানবতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল– যদি এই বিবাহ বন্ধন যেমন খুশি তেমন, যখন খুশি তখন, যেভাবে খুশি সেভাবে ভাঙ্গা-গড়ার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে এতে মানব জাতির এ মহান বৈশিষ্ট্য যেমন অর্থহীন হয়ে পড়ে তেমনি আল্লাহর বিধান, মানব মর্যাদা ও চারিত্রিক গুরুত্বও সমানভাবে আহত বিক্ষত ও অপমানিত হয়। বরং পরিস্কারভাবে আল্লাহর দেয়া পথ ও নির্দেশনার অবমাননা হয়। আর তারই শাস্তি হলো এই অপমানজনক ব্যবস্থা! নিজের বউকে অন্যের ঘরে নিবাস দান।

সহজ কথা, সম্মাজনক পথ পরিহার করে একে একে ক্রমে ক্রমে সময়ের বিশাল পরিসরে তিন তিনটি তালাক দিয়ে যে নারীকে সে বিদায় করেছে তার প্রতি তার ক্ষোভ ঘৃণা ও অসন্তোস হবে স্থায়ী এটাই তো স্বাভাবিক! তার দৃষ্টিতে এই নারীর মধ্যে এমন কোন কঠিন ব্যাধি ও সমস্যা ছিল উত্তম আচরণ উভয় পক্ষের সালিসী এমন কি এক তালাক দুই তালাক পরবর্তী বিয়োগ-বিচ্ছেদ ও একাকীত্বের কোন ঔষধেই তা কাটেনি। দূর হয়নি। বরং সে ছিল তার জীবনে ক্যান্সার স্বরুপ। অতঃপর তা জীবন থেকে সম্পূর্ণরুপে আলাদা করেই সে ক্ষান্ত হয়েছে। এত কিছুর পরেও যখন এই পুরুষ আবার এই নারীকে চায়, এই নারীও প্রস্তুত এই কঠিন নির্মম পুরুষটির কাছে ফিরে যেতে তখন কি এই দুটি প্রানীর স্বভাব চিন্তা ও সভ্যতার নীচুতাই ফুটে ওঠে না। অধিকন্তু আল্লাহর বিধানের প্রতি চরম উদাসীনতা উপেক্ষা ও অবহেলা তো আছেই। স্বভাব চরিত্র ও ধর্মগত এই পতনাসিঁড়িতে যার অবস্থান তার জন্যে তো নিজের বউ (সাবেক) কে অন্যের ভোগে ও আস্বাদনে কিঞ্চিত শায়েস্তা করে আনাই উচিত। এতে প্রথমত তার স্বভাব ও চরিত্রগত অবস্থান যেমন সমাজের সামনে ফুটে ওঠবে তেমনি আর দশজন দুষ্ট মানুষও শিক্ষা নিবে। কথায় আছেনা, যেমন বিমার তেমন দাওয়াই।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, এই দুষ্টজনরা 'হিল্লা' বিয়েকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, মনে হয় যেন এটা ইসলামে খুবই সম্মানিত ও কাংখিত একটি কাজ। অথচ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যক্তি হিল্লা করে এবং যে হিল্লা করায় উভয়ের প্রতি-ই লা'নত ও অভিশম্পাত বর্ষণ করেছেন। [ইব্ন মাজা শরীফ] কারণ, বিয়েটা হলো স্থায়ী একটা বন্ধন। হিল্লার নামে যেসব দুষ্ট চরিত্রের

লোকেরা এই পবিত্র বন্ধনকে অভিশপ্ত নাটকের রুপে কলংকিত করে, পরিণত করে মানহীন ফলহীন এক তুচ্ছ বিষয়ে তারা নির্ঘাত পাপী, বিয়ের আদর্শে উজ্জীবিত পবিত্র মানব সভ্যতার তারা চরম শত্রু।

সারকথা হলো, মানব জীবনকে স্বার্থক সুখময় ও ফলবান করে গড়ে তোলার পবিত্র এক আয়োজন বিয়ে। চূড়ান্ত অপারগতার ক্ষেত্রেই কেবল ভেঙ্গে দেয়া যায় এই আয়োজন। ভেঙ্গে দিতে পারে পুরুষ। পারে নারীও খোলার মাধ্যমে। তবে নারী যেহেতু অধিক আবেগাশ্রায়ী, পরিনাম দর্শনে অপরিপক্ক তাই ক্ষমতাটা তাকে সরাসরি না দিয়ে কাযী কিংবা আদালতের মধ্যস্থতার নিদের্শ দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, যাতে ভাঙ্গনটা কঠিন হয়। কারণ, ভাঙ্গন নয়, বন্ধনটাই ইসলামে কাম্য।

হযরত আইশা (রা.)-এর জবানীতে প্রিয় নবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবন

••

হযরত আইশা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ঘরে এসেছেন মাত্র নয় বছর বয়সে। তখন তিনি ছিলেন এক কোমলমতি কিশোরী। খেলা-ধুলা এই বয়সের প্রধান শখ! একজন সহযাত্রি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা এক মূহুর্তের জন্যে ভুলে যাননি। বরং এই বালিকা সঙ্গিনীকে খুশি করতে আপ্রান চেষ্টা করেছেন। আনসারী বালিকাদের তিনি ডেকে পাঠাতেন তাঁর সাথে খেলা ধুলা করার জন্যে। অন্য আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আইশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার আনসারী বালিকা বন্ধুরা আমার সাথে খেলতে আসতো। আমরা খেলাধুলায় মেতে উঠতাম। তারপর যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসতেন, তারা সবাই লুকোবার চেষ্টা করতো। নবীজি তাদেরকে আমার দিকে তাড়িয়ে দিতেন যেন আমার খেলা ভঙ্গ না হয়।

হযরত আইশা (রা.) আরও বর্ণনা করেছেন,একবার হাবশী বালকরা মসজিদে নববীর চত্বরে তীরান্দাজী শিখছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি দরোজার কাছে গেলাম। নবীজি দরোজার চৌখাটে হাত রেখে বাহুর নিচ দিয়ে আমাকে খেলা দেখার সুযোগ করে দিলেন। যেন পর্দার ক্ষতি না হয়। চিত্ত বিনোদন বলতে আমাদের সমাজে একটি কথা আছে। চিত্তের আনন্দের জন্য যা করা হয় তাই মূলত চিত্ত বিনোদন। ইসলামের সীমানার ভেতর থেকে মন-মানসে প্রফুল্লতা আনয়নের নিমিত্তে সকল বিনোদনই বৈধ। কিন্তু শরীয়তের বিধান লংঘন করে চিত্ত বিনোদনের নামে অপসংস্কৃতিকে আদৌ স্বীকার করে না ইসলাম।

এক চাঁদনী রাতের কথা। হযরত আইশা (রা) তখনও গায়ে-গতরে হালকা পাতলা। নবীজি বললেন, এসো তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করি। আইশাও রাজি হয়ে গেলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করেই তাঁকে জিতিয়ে দিলেন। তারপর যখন হযরত আইশা (রা.) একটু বড় হলেন, তখন এক রাতে নবীজির সাথে এক সাহাবীর বাড়িতে দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। নবীজি আজকেও প্রতিযোগিতার আহ্বান জানালেন। রাজি হয়ে গেলেন হযরত আইশা (রা.)। এবারের প্রতিযোগিতায় নবীজি বিজয়ী হলে হযরত আইশাকে বললেন, এটা সেই প্রতিযোগিতার প্রতিশোধ।

জীবনসঙ্গীনিকে খুশি করার জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যে গল্পও শোনাতেন। হযরত আইশা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের লোকজনকে একটি গল্প শোনালেন। এক মহিলা বলল, এ গল্পটি সম্পূর্ণ খোরাফার কাহিনীর মত আশ্চর্যজনক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, খোরাফার মূল ঘটনাটি কি ছিল জান? খোরাফা ছিল বনু আসবার এক ব্যক্তি। জিনেরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন আটকে রাখার পর এনে লোকালয়ে ছেড়ে দিয়ে যায়। জিনদের কাছে থাকাকালীন অবস্থায় যেসব আশ্চার্য ঘটনা সে দেখেছে লোকদের কাছে সে সেসব ঘটনা বর্ণনা করতো আর মানুষ তাতেই অভিভূত হতো। এরপর থেকে মানুষ কোন বিস্ময়কর ঘটনাকেই খোরাফার কাহিনী বলতে শুরু করে।

হযরত আইশা (রা.)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি গল্প শুনিয়েছিলেন বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। গল্পটি হলো, একবার এগারজন মহিলা এক মজলিসে জমায়েত হলো। তারা প্রতিজ্ঞা

করল, সকলে নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করবে। কেউ কিছু গোপনও করবে না, মিথ্যাও বলবে না।

তখন তাদের একজন বলল : আমার স্বামী এক অকর্মা পুরুষ। শীর্ণকায় দুর্গম পর্বতশীর্ষে সংরক্ষিত উটের গোশ্তের মত। (অর্থাৎ অপদার্থ অহংকারী এক চরিত্রহীন পুরুষ)।

দ্বিতীয়জন বলল : আমি আমার স্বামী সম্পর্কে কী বলব। কারণ, আমার আশংকা হয় যদি তার দোষের কথা বলতে শুরু করি, তাহলে শেষ করা সম্ভব হবে না। কেননা, বলতে গেলে ভেতরের-বাইরের সব কথাই বলতে হবে।

তৃতীয়জন বলল : আমার স্বামী অসম্ভব দীর্ঘ। যদি কোন কারণে মুখ খুলি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তালাক। আর যদি নীরব থাকি, তাহলে মাঝখানে ঝুলতে থাকি।

চতুর্থ মহিলা বলল : আমার স্বামীর মেজাজ তিহামার রজনীর মত। সুষম নাতিশীতোষ্ণ। তার সম্পর্কে কোন ভয়ও নেই,দুঃখ কষ্টের আশংকাও নেই।

পঞ্চম মহিলা বলল : আমার স্বামী যখন ঘরে আসেন, তখন চিতা হয়ে যায়। যখন বাইরে যায় তখন থাকেন সিংহ। ঘরের কোন কিছু ঘাটাঘাটি করেন না।

ষষ্ঠজন বলল : আমার স্বামী খেতে বসলে সব সাবাড়। পান করতে বসলে পানপাত্র শূন্য। যখন শয়ন করেন, তখন নিজে নিজেই কাপড়ে জড়িয়ে যান। আমার প্রতি হাতও বাড়ান না, আমার দুর্দশা আঁচ করার জন্যে।

সপ্তমজন বলল : আমার স্বামী সহবাসে অক্ষম-অপুরুষ। বোকাটা কথা বলতে পর্যন্ত জানে না। দুনিয়ার সকল ব্যাধির আকর। স্বভাব উগ্র। আমার মাথা ফাটিয়ে দিতে কিংবা শরীর ক্ষত-বিক্ষত করতেও তার পরোয়া নেই।

নবমজন বলল : আমার স্বামী বড় মাপের মানুষ। অথিতিপরায়ণ। দীর্ঘকায় সুপুরুষ। আবাস তার সুউচ্চ। গৃহ কোণে সর্বদা ছাইয়ের স্তূপ পড়ে থাকে। তার ঘর 'দারুল মাশওয়ারা' বা পরামর্শ কেন্দ্রের নিকটে।

দশমজন বলল : আমার স্বামী মালিক। মালিকের কথা আর কী বলব! এপর্যন্ত যত প্রশংসা করা হয়েছে এবং আমি যত প্রশংসা করব মালিক তার চাইতেও অনেক ঊর্ধ্বে। তার বিপুল পরিমাণ উট আছে। সেগুলো প্রায়ই বাসগৃহের সন্নিকটে রাখা হয়। (যাতে আতিথেয়তায় বিঘ্ন না ঘটে) উটগুলো চারণভূমিতে খুব কমই যায়। এগুলো যখন বাদ্যের ধ্বনি শুনে, তখন বুঝে ফেলে সময় ফুরিয়ে এসেছে।

একাদশ মহিলা উম্মে যারআ' বলল : আমার স্বামী আবু যারআ'। আবু যারআর কথা আর কী বলব। অলংকারের ভারে সে আমার কাঁধ ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। আমার বাহুদ্বয় খাইয়ে-দাইয়ে চর্বিপূর্ণ করে দিয়েছে। সে আমাকে সদা এত প্রফুল্ল রাখে যে, আমি নিজেই নিজের গুণে বিমুগ্ধ হতে থাকি। সে আমাকে একটি দরিদ্র বৈভবহীন পরিবার থেকে তুলে এনেছে। সে পরিবারটি দারুণ অভাব অনটনের মধ্যে দিন গুজরান করত। তাদের জীবিকার উৎস ছিলো কয়েকটি বকরী মাত্র। সেখান থেকে সে আমাকে একটি স্বাচ্ছন্দ্যভরা ঘরে নিয়ে এলো। যেখানে ঘোড়া, উট, চাষের বলদ সবই ছিল। আমার কোন কথাতেই সে আমাকে মন্দ বলত না। আমি অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোতাম। কেউ আমাকে জাগাতে পারত না। পানাহারের এমন প্রাচুর্য ছিল,আমি তৃপ্ত হয়ে ওঠে যেতাম খাবার শেষ হতো না। আর আবু যারআর মা! (আমার শাশুড়ী)। তার কী প্রশংসা করব। তার বড় বড় পাত্র সর্বদা পূর্ণ থাকত। তার ঘর বিশাল। (অর্থাৎ ঘর মন সবই বড় ছিল)। আবু যারআর পুত্ররত্নের কথা কী বলব। সে তো ছিল সোনায় সোহাগা। হালকা ছিপছিপে দেহ অবয়ব। পাঁজরের হাড়গুলো বৃক্ষ শাখা অথবা কোষমুক্ত তরবারীর মত চিকন। ছাগল ছানার একটি বাহুই তার উদর পূর্তির জন্যে যথেষ্ট। (অর্থাৎ বীর পুরুষ) আবু যারআর কন্যার কথা আর কী বলব। সে ছিল মায়ের তাবেদার, পিতার অনুগত, নাদুস-নুদুস, সতীনের চোখ জ্বালা করার মত সকল বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। (আরবে হালকা পুরুষ আর পুষ্ট নারী খুব প্রশংসিত)। আবু যারআর বাঁদীর গুণাবলীও বর্ণনাতীত। ঘরের কথা বাইরে বলে না। অনুমতি ছাড়া খানা পিনাও ব্যয় করত না। ঘর-দোর রাখতো ঝকঝকে পরিস্কার। ফলে আমাদের দিনগুলো কাটছিল অসীম আনন্দে।

কিন্তু একদিন হলো কী! সকাল বেলা যখন দুধের পাত্র ঘাঁটা হচ্ছিল, তখন আবু যারআ ঘর থেকে বের হলো। পথে দেখা হলো এক নারীর সাথে। তার কোমরের নীচে চিতার মত দুটি শিশু ডালিম নিয়ে খেলা করছিল। ব্যস, মহিলা তার মনে আসন করে নিল। সে আমাকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করে ফেলল।

এক বর্ণনায় আছে, তাকে বিয়ে করে ফেলল। তারপর সে আমাকে তালাক দেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করল। অবশেষে আবু যারআ আমাকে তালাক দিয়ে দিল। তারপর আমি এক সরদার ভদ্রলোককে বিয়ে করলাম। সে ঘোড় সওয়ার যোদ্ধা পুরুষ। সে আমাকে সহায়-সম্পদ প্রচুর দিয়েছে।

উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি দিয়েছে জোড়ায় জোড়ায়। সে আরও বলেছে, উম্মে যারআ! নিজে খাও এবং যা মনে চায় স্বীয় পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দাও।

কিন্তু সত্য বলতে কী! যদি তার সকল দান একত্র করি, তাহলে তা আবু যারআর এক ক্ষুদ্রতম দানেরও সমান হবে না।

হযরত আইশা (রা.) বলেন, এই গল্প শুনিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আইশা! আবু যারআ উম্মে যারআর জন্যে যেমন, আমিও তোমার জন্যে তেমন।

সত্যিই ভাবার বিষয়। সারা জাহানের বাদশাহ! সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জীবনসঙ্গিনীকে কত বিশাল গল্প শোনাতেন। তাঁর মন চিত্ত কত উদার, কত বিশাল। সারা রাত দিন যার ভাবনা আগত-অনাগত বিশ্বময় সকল মানুষ নিয়ে; তাদের অফুরন্ত কল্যাণ আর চিরন্তন মুক্তি নিয়ে, তিনিই আবার পারিবারিক অঙ্গনে স্বীয় সহধর্মিনীর পাশে একজন সোহাগভরা বন্ধুরুপে আবির্ভূত হচ্ছেন। শত অভাবের সংসারে চিত্রায়ন করছেন ভূপৃষ্ঠে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গৃহস্বামীর অপূর্ব চিত্র।

আজ আমাদের মধ্যে এমন মানুষও আছেন, যারা নিজেদেরকে বেশ উপরের শ্রেণীর মুসলমান মনে করেন । অথচ তারাই আবার বুক ফুলিয়ে বলেন, আমাদের বউরা আমাদের সামনে মুখ খোলার পর্যন্ত সাহস পায় না। আর গল্প করার সময় কোথায়? আমরা সর্বদা ধর্ম-কর্ম নিয়েই অস্থির। হযরত আইশা (রা.) এর এই ঘটনা তাদের জন্যেও।

নারী : হৃদয় যেখানে সমর্পিত

••

হৃদয় ও শরীরের সমন্বয়ে মানুষ। শরীরহীন কোন সত্তা যেমন মানুষ নয়, তেমনি হৃদয়হীন কোন দেহও মানুষ নয়। ধর্ম ও সভ্যতার ফয়সালাও এটাই। এ কারণেই ধর্মে যেমন শরীরের ভাল-মন্দ বিচার করা হয়, তেমনি হৃদয় ও আত্মার শুদ্ধি ও শান্তিকেও যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সভ্যতার প্রভাব নির্মাণ হয় মানুষের মন ও আত্মায়। দেহ-মন, শরীর-আত্মা, বদন ও হৃদয়ের এই সমন্বিত সাধনাই মানব জীবনকে করে তুলে সফল, স্বার্থক ও ফলবান। পক্ষান্তরে এই দুয়ের পরস্পর দূরত্ব ও বিরোধ জীবনকে শুধু বিষিয়েই তোলে না, বরং পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত করে ছাড়ে। করে ছাড়ে বিষণ্ন ও ধ্বংস।

মূলত মানব জীবনের এই পূর্ণতা, হৃদয় বদনের ফলবান এই সমন্বয়ের কাঙ্খিত লক্ষ্যেই দাম্পত্য জীবনের আয়োজন। কারণ, এই মানব জীবনের প্রতিটি সত্তার যেমন ভেতর-বাহির দু'টি পিঠ আছে, তেমনি সমাজ জীবনেরও ভেতর বাহির দু'টি পিঠ রয়েছে। এর একটি নর, অপরটি নারী। দুয়ের সুশৃঙ্খল সমন্বিত ফসলই যুগ-যুগান্তরে এই মানব-সভ্যতা, মানব-সংসার।

মানব জীবনে প্রতিটি পুরুষ সকাল-সন্ধ্যা যে হাড়ভাঙ্গা খাঁটুনি বিলিয়ে যায় শরীরের আহার সন্ধানে, ধর্মপ্রাণ সেই পুরুষই আবার তার এই সুখ-স্বপ্ন ও কল্পনার পূর্ণতা খুঁজে ফিরে কোন মমতাময়ী নারীর কোমল পরশে। অস্থির হয়ে পড়ে সে এমন কোন ঠিকানার সন্ধানে– যেখানে সমর্পিত হবে তার হৃদয়, স্বপ্ন, ভাবনা ও জীবনের বাঁকে বাঁকে লালিত গচ্ছিত যত কথা! একইভাবে শারীরিক কোমলতায় নমিত নারীদেহ জীবন ও জীবিকার অনিবার্য প্রয়োজনে যেমন পরম বিশ্বাসে ভরসা পেতে চায় কোন সক্ষম হৃদয়বান পুরুষের উপর, তেমনি তার কোমল বদন মন স্বপ্ন অনুভব সদা খুঁজে ফিরে এমন এক উর্বর ফসলী মাঠ, হৃদয়ের সকল মমতা প্রেম ও মাধুর্য ঢেলে

যেখানে ফলাবে মানবতার সোনার ফসল। আর এই দুই সন্ধান, দুই স্বপ্ন ও দুই প্রেরণার সমন্বিত রূপই হলো আদর্শ দাম্পত্য জীবন। সুবাসিত এই মহৎ দাম্পত্যের সূচনা হয়েছে সৃষ্টির সূচনা থেকেই। তাই ইতিহাসের প্রথম মানব-মানবী প্রথম দম্পতিও। তারা অপরূপ বেহেশতে যেমন পরস্পর পাশাপাশি ছিলেন পাপদগ্ধ এই ঘাত-প্রতিঘাতের দুনিয়াতেও ছিলেন একে অপরের সঙ্গী-জীবনসঙ্গী। তারা একে অন্যের অংশীদার প্রাপ্তিতে বঞ্চনায়, সুখে-দুঃখে এবং স্বপ্ন ও নির্মাণে– জীবনের সকল ক্ষেত্রে।

হযরত আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.) হলেন প্রথম মানব-মানবী এবং মানবতার প্রথম মডেল। দাম্পত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই তারা এই মাটির পৃথিবীতে আগমন করেছেন, যাতে করে কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য প্রতিটি আদম সন্তান জীবনের পূর্ণতা অনুসন্ধান করে দাম্পত্যের মাঝেই। সম্ভবত এ কারণেই হযরত আদম (আ.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান কুল মানবতার অহংকার হযরত মুহাম্মাদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বিয়ে আমার সুন্নত, আমার আদর্শ। আর বলেছেন, যে বিয়ে করল সে যেন দীনের অর্ধেকটা পূর্ণ করল। অধিকন্তু বলেছেন, ইসলামে কোন বৈরাগ্যতা নেই। এসব বাণী থেকে এ কথাই প্রতিভাত হয়, ইসলাম নারী-পুরুষের স্বভাবজাত চাহিদা, মানব-মানবীর সুখময় ফলময় বন্ধনকে শুধু সমর্থনই করে না, করে উৎসাহিত এবং উৎসাহিত করেই ক্ষান্ত হয়নি। সেই বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার যাবতীয় কৌশল এবং পথও বাতলে দিয়েছে অতীব যত্নের সাথে।

দুর্বল নারীর শারীরিক যত্ন, কোমল হাত ও মনের যথার্থ লালনের দিকে তাকিয়ে কামাই-রোজগার, সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ কঠোর সকল কর্তব্য এই বলে বলবান পুরুষের কাধে তুলে দিয়েছে– "আর রিজালু কাওয়ামূনা আলান নিসা" অর্থাৎ পুরুষরাই নারীর কর্তা। অভিমানী নারীর মখমল-হৃদয় ও সোহাগী বাঁকামী যাতে হারিয়ে না যায় মানব বাগিচা থেকে সে জন্য পুরুষকে সতর্ক করা হয়েছে এই ভাষায়– "ওয়া 'আশিরহুন্না বিল মারূফ" অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তমরূপে জীবনযাপন কর। আরো ইরশাদ হয়েছে– যদি তাদের মাঝে মন্দ কিছু দেখ, তাহলে তার অতীত কল্যাণের কথাটিও স্মরণ কর।

পক্ষান্তরে নারীকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমযানের রোযা রাখবে,

চরিত্রকে পবিত্র রাখবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, সে বেহেশতের যে দরোজা দিয়ে খুশি প্রবেশ করবে। [আবু নাঈম]।

অন্য হাদীসে আছে, পুরুষের উপর সবচেয়ে বড় হক তার মায়ের আর নারীর উপর সবচেয়ে বড় হক তার স্বামীর।

পশু ও মানুষের মধ্যে অন্যতম মৌলিক পার্থক্য হলো, পশুদের দাম্পত্য জীবন নেই, মানুষের আছে। যৌনক্ষুধা পূরণের ক্ষেত্রে পশুদের কোন বিধি-নিষেধ নেই, মানুষের আছে। আর এ কারণেই শয়তান সর্বোচ্চ মনোযোগসহ তৎপরতা চালায় এই দাম্পত্যের বাঁধন ভাঙ্গার পেছনে। তার কারণ, মানুষের জীবন থেকে এই বাঁধনটি আলগা করে ফেলতে পারলেই তাদের আর পশুদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। ফলে মানুষের সমাজ আর বন্য পশুদের সমাজ হবে একাকার।

সংসার ভাঙ্গার এই বিনাশী পয়গাম নিয়েই আজ দ্বারে দ্বারে ঘুরছে সেবার ক্যাপ মাথায় দিয়ে শয়তানের ভারবাহী এনজিওগুলো। নারীকে স্বনির্ভরতার নেশা খাইয়ে এক স্বামী থেকে আলাদা করিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে শত স্বামীর (পরপুরুষ) মাঝে। ফলে ভাংছে ঘর, ভাংছে সংসার। অতঃপর দাজ্জাল বৃটিশী আইনের পেছনের দরোজা দিয়ে অসহায় সন্তানের দোহাই দিয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার পূর্বের স্বামীর ঘরে। রিপুর তাপে গলে যাচ্ছে স্বামীও। শুরু হচ্ছে নতুন করে ব্যভিচারের পথে নিয়মিত যাত্রা। আল্লাহর বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের এই ভয়াবহ অপরাধের বিষফল আজকে এসিড, খুন, যৌতুক, নিপীড়ন ও তালাকের পৃথিবী! পাপের এই রাজ্য একান্তই প্রিয় শয়তানের এবং শয়তানের চামুন্ডদের। আজ সত্যিকারের মানুষরা যেখানে বন্দী।

মানব-মানবীর এই কাঙ্খিত বন্ধনকে ধরে রাখতে হলে প্রথমেই যে বিষয়টি স্থির করে নিতে হবে, তাহলো– তারা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু। জীবনবন্ধু– প্রতিপক্ষ নয়। আর বন্ধুত্বের প্রধান দাবী হলো পরস্পরকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা, একে অন্যের মন, চাহিদা, স্বপ্ন ও অনুভূতিকে প্রাণ খুলে বুঝতে চেষ্টা করা। অতঃপর প্রিয় সঙ্গীর মন স্বপ্ন অনুভব ও ভাল লাগাকে নিজের কামনা ও ভাল লাগার উপর প্রাধান্য দেয়া। মূলত প্রাণের, ভাল লাগার ও ভাল লাগাকে উপলব্ধি করার এই অন্তরঙ্গতাই তো দাম্পত্য জীবনের মহান সুখ ও স্বার্থকতা– যেখানে এসে স্বপ্নে, চাহিদায়, প্রাপ্তিতে, ভাবনায়, বঞ্চনায় একাকার হয়ে যাবে দু'টি মন, দু'টি তনু, অনুভূতির দু'টি স্বতন্ত্র পৃথিবী! অতএব, যে স্বামী কিংবা স্ত্রী তার জীবন বন্ধুর অন্তরে হাত

দিয়ে তার অনুভূতিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে না; পাঠ করতে চায় না তার ভাল লাগার কথকথা কিংবা পড়ার চেষ্টা করে না তার হৃদয়ের আকাশে অংকিত অব্যক্ত প্রেমের কাব্য সে প্রকৃত অর্থে স্বার্থক স্বামী কিংবা স্ত্রী নয় বরং মানব সংসারের একেকটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রাংশ মাত্র।

সার কথা হলো, মানব সভ্যতার লালন ও মানবতার বিকাশ উৎস মধুময় দাম্পত্য জীবনকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হলে কয়েকটি টিপ্‌স সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। যথা–

১. স্বামীকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে, তার স্ত্রী তার জীবনসঙ্গীনী, হৃদয়, মন ও স্বপ্নের সমর্পিত ঠিকানা। সে আদৌ তার সেবকিা নয়। তাই তার মন ও অনুভূতিকে বুঝতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে এবং তাকে সম্মানের সাথে অবস্থানের সুযোগ দিতে হবে।

২. স্ত্রীকেও মনে রাখতে হবে, তার স্বামীই তার মাথার তাজ। সংসারের কর্তা স্বামী! শরীয়ত সম্মত সকল ক্ষেত্রেই তার কথা মাথা পেতে নেবে। প্রতিবাদে নয়, সমর্পণের যাদুর ছোঁয়ায় স্বামীকে স্বীয় হৃদয়ের কোঠায় ধরে রাখতে হবে।

৩. পরস্পরের সম্পর্ক হবে ভালবাসার সূতোয় গাঁথা, আইনের শৃঙ্খলে বন্দী নয়।

৪. যৌথ সংসারের ক্ষেত্রে স্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনের সংরক্ষণ স্বামীর কর্তব্য। গীবত, কথায় কথায় অভিযোগ ও ত্রুটি সন্ধানের পথকে কঠোরভাবে রোধ করতে হবে স্বামীকেই।

৫. কখনো পরস্পরে দূরত্ব সৃষ্টি হলে, প্রেমের পিঠে অবাঞ্ছিত বরফ জমে ওঠলে তা নিজেদেরই সরাতে হবে প্রেমের পরশ বুলিয়ে। অতীত সম্পর্ক ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে উভয়কেই। তাহলে সমস্যাকে জয় করা সহজ হবে।

৬. উভয়কেই নামায-রোযা কুরআন তিলাওয়াতসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান মেনে চলতে সচেষ্ট হতে হবে। সোনা-গয়না অর্থ-বিত্ত আর পার্থিব লাভ-লোকসানের আলোচনার পরিবর্তে ঘরে ধর্মীয় গ্রন্থাবলী পাঠের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। নিশ্চয়ই শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণই মানুষকে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও কল্যাণ পথের সন্ধান দিতে পারে, অন্য কিছু নয়।

কতিথ স্বাস্থ্যকর্মী নারী : নারীর ডাইনী রূপ

যদি বলি, মাটির এ পৃথিবীতে খোদার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মানব সম্পদকে যদি মানি জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহলে একথা মানতেই হবে নারীই হলো সে সম্পদের 'অমূল্য খনি'। মহান সৃষ্টিকর্তাও এ কারণেই নারীকে 'ফসলী জমি'তে আখ্যায়িত করে ইরশাদ করেছেন, 'নিসা-উকুম হারছুল লাকুম...। সুতরাং মানব উন্নয়তের এই সোনালী জমির মূল্য ধর্মে যেমন স্বীকৃত, তেমনি স্বীকৃত সমাজেও। ধর্ম যেমন বলেছে, 'বেহেশত মায়ের পায়ের নীচে'। তেমনি সমাজ বলেছে, 'মায়ের মতো আপন কেহ নাই'।

কিন্তু বিব্রত হই তখন যখন দেখি এই নারীই মাঠে নেমেছে তার ফসলী জমিকে 'নিষ্ফলা-পতিত' জমিতে রূপান্তিরিত করতে। অনাগত সন্তানদের আগমন পথ রোধ করে দাঁড়াতে সকাল-সন্ধ্যা গ্রাম-গঞ্জ-শহরে স্বাস্থ্যকর্মী নামের যে পিশাচীরা দল বেঁধে সরলমনা মা-বোনদেরকে প্রতারিত করে ফিরে– বিস্মিত হই তাদেরকে দেখে। বিস্ময়ের নবতরঙ্গে ধাক্কা খাই তখন যখন দেখি কোল আলোকিত করা নারীছেঁড়া ধন সোনামণিদেরকে কোলে নিয়ে মায়েরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে এই পিশাচীদের মায়াবী কুমন্ত্রণা। বলি, প্রিয় বোনেরা! তোমরা কি বুঝো না! এই ডাইনীরা তোমাদের হৃদয়ের ধন ওই পুত্র-কন্যাদেরকে এই দুনিয়াতেই আসতে দিতে চায়নি। এই ডাইনীরা তোমাদের কোমল কোলের এই মায়াময় মুখগুলোর আজন্ম দুশমন। সে দুশমন তোমার বিশ্বাসের, ধর্মের, মাটির, তোমার লাল-সবুজের পাতাকার।

প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় উম্মতকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছেন তোমরা এমন নারীদেরকে বিয়ে করো যারা প্রেম ও মমতায় তোমাদের জীবনকে ভরিয়ে দেবে; আরো দেবে বিপুল সন্তান। কারণ, আমি হাশরের মাঠে তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করবো। [আবু দাউদ, নাসাঈ শরীফের সূত্রে মিশকাত]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় খাদেম হযরত আনাস (রা.)কে এভাবে দুআ দিয়েছেন : হে আল্লাহ! আনাসকে বিপুলসংখ্যক সন্তান ও সম্পদ দাও। আর যা দেবে তাতে বরকতও দিও। [বুখারী- ৩৬১]

এ হলো রাসূলের বাণী। আর বেঈমান আমেরিকা বলেছে : মুসলিম দেশগুলোর দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা আগামী ২৫ বছরের মধ্যে আমেরিকার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব দেশ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামরিক শক্তিতে উন্নতি লাভ করবে; আরো অনেক বলবান হয়ে ওঠবে। অথচ এসব দেশ থেকে আগত উপাদানেই ইউরোপ-আমেরিকার কারখানার চিমনীগুলো গরম হয়। এভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে তারা তাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো নিজেদের কব্জায় রাখতে চাইবে, ফলে মুনাফাখোর শ্রেণীর (ইউরোপ-আমেরিকা) বিরুদ্ধে তারা ঘৃণায় ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠবে। এ ক্ষোভ ও ঘৃণা আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করবে। ফলে তৃতীয় বিশ্বে আমেরিকার 'সুবিধাগুলো' বিঘ্নিত হবে।' [আমেরিকান রিপোর্ট, ২০০০]।

সহজ কথা, আল্লাহর গজবের শিকার ইউরোপ-আমেরিকায় যখন আশংকাজনকভাবে নারী ও পুরুষরা বন্ধ্যাত্বের শিকার হচ্ছে, বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে যখন তাদের জনসংখ্যার হার হ্রাস পাচ্ছে, বিপরীতে খোদার রহমতে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে ঈর্ষণীয় গতিতে। তখন ধুরন্ধর প্রতারক খৃষ্টজগত চিহ্নিত গরীব মুসলমানদের সামনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুলা ঝুলিয়ে শান্তি ও স্বচ্ছলতার বিষাক্ত টিকটিকি গিলিয়ে ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যাকে রোধ করার জন্য শয়তানের আদিম জাল ভার্যা ডাইনীদেরকে মাঠে ছেড়ে দিয়েছে মানবতার কোমল ঠিকানা মুসলিম নারীদেরকে পথভ্রষ্ট করার জঘন্য লক্ষ্যে।

বলি, জন্মনিয়ন্ত্রণ করলেই যদি সুখ হয় তাহলে ওই সুখের পায়রা তোমরা তাড়িয়ে দাও কেন? অধিক সন্তানই যদি জীবনের বিষয় হয় তাহলে তোমরা সে বিষ পান করছো কোন তাড়নায়? এই তো তোমাদের পোপজী দ্বিতীয় জন পল ১৯৯৯ ঈ. সালের ৭ নভেম্বর নেহেরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৫০ হাজার খৃষ্টান জনতার উদ্দেশে বলে গেলেন : তোমরা তোমাদের জনসংখ্যা কমাতে চেষ্টা করবে না। বরং বাড়াতে চেষ্টা করো। ক্ষুধা ও

দারিদ্র্যের তাড়নায় গর্ভপাত কিংবা অন্য কোন কৃত্রিম পন্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ অবৈধ। তিনি তার এই ঐতিহাসিক ভাষণে জন্মনিয়ন্ত্রণকে 'মরণ কালচার' বলে আখ্যায়িত করেন।

ইউরোপের অন্যতম মুল্লুক ফ্রান্স দীর্ঘ বছর যাবত জনসংখ্যা বাড়াতে যারপরনাই সাধনা করে চলছে। ইউরোপিয়ান নেতৃবৃন্দরা বলছেন : জন্মনিয়ন্ত্রণ ইউরোপকে বিরান ভূমিতে পরিণত করছে। তারা জন্মনিয়ন্ত্রণকে 'আত্মহত্যা' বলে অভিহিত করেছেন। এমন কি সেখানে যে নারী তৃতীয় এবং চতুর্থ সন্তানের জননী হবে তাকে তিন বছর পর্যন্ত সম্মানজনকভাবে ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে নারীরা অধিক হারে সন্তান জন্ম দিতে উৎসাহবোধ করে।

এই হলো খৃষ্টানদের নিজেদের পলিসি। স্বদেশে-স্বজাতির নারীদেরকে উৎসাহিত করে অধিক সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য। প্রতিপক্ষ মুসলমানদেরকে এসে শোনায় ভিন্ন দর্শন। বলে, ছেলে হোক মেয়ে হোক একটি সন্তানই যথেষ্ট। বলি, একটি সন্তান তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট? তাহলে আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে কেন?

শেয়ালের কাছে কুমির তার সাত সন্তানকে পড়তে দিয়েছিল বলে একটি গল্প আছে। অতঃপর ধূর্ত শিয়াল একে একে কুমিরের সাত পুত্র ভক্ষণ করে দিয়েছিল চম্পট। সে গল্প আমরাও বলি রসিয়ে রসিয়ে। এবং বলি, কুমিরটা কী বোকা গো! অথচ আমরা শত্রুদের প্ররোচণায় সুখের হরিণ ধরার মিথ্যে নেশায় নিজেরাই হত্যা করছি নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরকে। নিজেদের সন্তানদেরকে। তাহলে আমর কি কুমিরের চাইতে অধিক বোকা নই! না জেনে না বুঝে এভাবে নিজ হাতে নিজ সুখের নেশায় নিজ সন্তান হত্যা করাকে যদি বুদ্ধিমত্তা বলি তাহলে হিংস্র পশু কাকে বলবো?

সারকথা হলো, শত্রুরা খোদার গজবে পড়ে হারিয়ে ফেলেছে সন্তান প্রজননের ক্ষমতা। অথচ ওরা মোড়ল। ওরা দেখছে অদূর ভবিষ্যতে মোড়ল বাড়িতে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাবারও কেউ থাকবে না। তারও আগে এতদিন ধরে যাদের উপর নির্বিচারে চালিয়েছে রকেট হামলা, অসহায় সেই ইরাকী-আফগানী আর চেচেনরা দলে দলে আসছে মোড়লবাড়ি দখল করতে। ওরা দেখছে, সোয়াশ' কোটি কাবাপন্থীর আড়াইশ' কোটি হাত এখন পাঁচশ'

কোটি... । ওরা দেখছে, মোড়লবাড়ির সাদা দুলালদেরকে ঠেঙিয়ে চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে মারছে মোড়লবাড়ির দেয়ালের বাইরে। ভয়ে শংকায় মুখ ওদের নীল। ওরা ওদের ভয় কাটাতে 'মায়া' বড়ি দিয়ে ডাইনীদেরকে পাঠিয়েছে যেন ওই 'হাতগুলো' দুনিয়াতে আসতে না পারে। অথচ সসম্মানে বেঁচে থাকতে হলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে সোয়াশ' কোটি মুসলিম উম্মাহকে হাজার কোটিতে উন্নীত হতে হবে। অতএব, হে মুসলিম নারী! কথিত স্বাস্থ্যকর্মী ডাইনীদের থেকে সাবধান!

[তথ্য সূত্র. ডাইজেষ্ট বেদার জুলাই ২০০৫ ইং]

সিঙ্গেল মাদার থিওরি : আইন মন্ত্রীর আশ্বাস গণিকাবৃত্তির শুভকাল ॥ মানব সভ্যতার বিদায়

অবশেষ গরীবের কথাই সত্য হলো। আন্তর্জাতিক মোড়লদের চোখের কোণার বাঁকা ইঙ্গিতে যখন পরিচয়পত্রে পিতার নামের সাথে মায়ের নামও লিখতে হবে মর্মে ধ্বনি উঠেছিল, তখনই এ দেশের সচেতেন সভ্যজনরা বলেছিলেন- এই দাবী 'শুভ দাবী' নয়। এর পশ্চাতে অনেক ঘৃণ্য তত্ত্ব রয়েছে। তারা তখন সর্তক করে এও বলেছিলেন- আমেরিকার মতো প্রগতির মহামারিতে আক্রান্ত কথিত উন্নত দেশগুলোতে ফ্রি মাইন্ড চর্চা ও নারী স্বাধীনতার অনুগ্রহে বিপুলহারে বাবা পরিচয়হীন যে উন্নত জাতের আদমচারা গজাচ্ছে, মূলত ওই পিতৃহীন উন্নত সভ্যতাকে এদেশে লাইসেন্স দানেরই পূর্বাভাস- পরিচয়পত্রে মায়ের নামের সংযুক্তিকরণ মর্মে প্রদত্ত আইন ও নির্দেশ। কিন্তু কে শোনে তাদের কথা। তাছাড়া ওসব উটের যুগের কাহিনী শোনে কে এই রকেট যুগে বসে। বাবা- মায়ের যৌথ বন্ধনের সুরভিত ফসল আগামী দিনের উত্তরাধিকারী সন্তান- সে তো মধ্যযুগীয় সভ্যতা। এটা নতুন

যুগ। পৃথিবী এখন নতুন। নতুন কালে, নতুন পৃথিবীতে নতুনত্ব চাই। নতুনত্ব কী? আগে সমাজে মানুষ হিসেবে মাতৃত্বের দাবী করতে হলে নারী আশ্রয় নিত স্বামীর। স্বামী-স্ত্রীর বৈধ সম্পর্কই কেবল উপহার দিতে পারতো 'মা ও বাবা' হওয়ার মর্যাদা। এই সভ্যতা প্রাগৈতিহাসিক, এই সভ্যতা শাশ্বত।

কিন্তু এখন কালটা ভাঙ্গার। মানুষ পুরনোটা ভাঙ্গে। নতুনটা করে গড়ে। ভাঙ্গা-গড়ার এই উদ্যমকালে কেউ পুরনো সভ্যতার শেকালে বাঁধা পড়ে থাকতে চায় না। চায় না বলেই এখন তারা নতুন সভ্যতা গড়তে চায়। এই নতুন এক চমৎকার তথ্য প্রকাশ করেছে ঢাকার দৈনিক 'আজকের কাগজ'। প্রথমে শিরোনাম লক্ষ্য করুন-

'মা দিবসে সিঙ্গেল মায়েদের দাবী ॥ জন্ম নিবন্ধনে শুধু মায়েদের নাম লেখা হোক' [আজকের কাগজ, প্রথম পৃ.৮ মে, '০৫ ঈ.]

মা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জড়ো হয়েছিলো একদল কথিত যৌনকর্মী। যাদের পাশে স্বামী নেই। কোলে অবশ্য সন্তান আছে। স্বামী যে শুধু পাশে নেই, তা নয়। স্বামী ঘরেও নেই। তাহলে কোথায় আছে? এই প্রশ্নটিই হলো মানব সভ্যতার শাশ্বত অর্জন। যুগ যুগ ধরে মানুষ যে সভ্যতা লালন করে আসছে, যে সভ্যতার ছায়ায় মানব কাফেলা সফররত প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সেই সভ্যতার যারা প্রাচীর ভাঙ্গতে চায়, যারা চায় মানবতা ও পশুত্বের ক্ষয়ে যাওয়া সামান্য সামাজিক দেয়ালটাকেও ভেঙ্গে দিতে, তারা ওই প্রশ্নটিকেও অবশেষে গলাটিপে হত্যা করেছে। স্বামীহীনা নারীর কোলে সন্তান দেখে কেউ যাতে ওই কুলটা কুলাঙ্গিনী আঁধারচারিণীকে এই প্রশ্নটিও করতে না পারে, তাই এই নতুন পরিভাষা- 'সিঙ্গে মাদার'।

বেশ চমৎকার লেভেলই বটে। কিন্তু ওই চমৎকার রঙিন কৌটার ভেতর যে জাতি ও সভ্যতার মরণ বিষ গচ্ছিত রয়েছে, সে কথা কি আমাদের সমাজ জানে?

এই প্রশ্নটাও এসেছে অপর একটি ঘটনা থেকে। গত ৩রা মে'০৫ ঈ. মঙ্গলবারের দৈনিক ইত্তেফাক দেখলাম, দেশের বিদ্বান কাণ্ডারী, ইসলামী মূল্যবোধের সরকারের গুণধর আইন মন্ত্রী [ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ] মহোদয় জানিয়েছেন- যৌন কর্মীদের সন্তানদের জন্য দত্তক প্রথা চালু করবেন শীঘ্রই। দেশের চলমান আইনে এবং ইসলামী বিধি মতে 'দত্তক' সন্তানদের জন্য কোন উত্তরাধিকার অংশ নেই বিধায় মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, গণিকাদের ওই অসহায় সন্তানরা যারা দত্তক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, আইন সম্মতভাবে

যাতে তারা দত্তক গ্রহীতা পিতার সম্পদে অংশ পায়, আইন করে গুণী মন্ত্রী মহোদয় সেটাই নিশ্চিত করতে চান।

সাবাশ মন্ত্রী, সাবাশ। এই না ইসলামী মূল্যবোধ। গণিকাবৃত্তিকে এভাবে মূল্যায়িত করতে কি আর কোন সরকার পেরেছেন? ইতিপূর্বে কোন হৃদয়বান মন্ত্রী কি এভাবে পতিতাবৃত্তিকে উৎসাহিত করতে পেরেছেন? পারেননি, করেননি।

আমাদের দেশে পশ্চিমা থিওরি মতে, এখনও 'জোর পূর্বক' ব্যভিচারকেই কেবল 'ব্যভিচার' বলে গণ্য করা হয়। বুঝিয়ে- সুজিয়ে, প্রেমে কৌশলে পরকন্যা- পরস্ত্রীকে কিছু করলে সেটা ব্যভিচার নয়। এতোকাল বিষয়টি এপর্যন্তই ছিলো। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় চাইলে এখানে ও সময় থাকতে একটি অবদান রেখে যেতে পারেন। আইনসিদ্ধ করে ঘোষণা দিয়ে যেতে পারেন- পরকন্যা কিংবা পরনারীর সাথে নরমে- কোমলে, প্রেমে-ফন্দিতে কেউ কিছু করলে সেটা ব্যভিচার হবে না।

লাভ? লাভ হলো, মন্ত্রী মহোদয়ের ৩ তারিখের ঘোষণার পরই ৭ তারিখে যেভাবে গণিকাতন্বীরা মিডিয়ার সামনে চলে এলো হৈহৈ করে, উদ্দীপ্ত কণ্ঠে জানিয়ে গেল- 'জন্ম নিবন্ধনে শুধু মায়ের নাম লেখা হোক'। বুঝা গেল, গণিকা-সুন্দরীরা মাননীয় মন্ত্রীর প্রতি বেশ খোশ। তাই তারা এখন সন্তানকে দত্তক প্রথার কাঙ্খিত পরিবর্তিত রূপে সামাজে প্রতিষ্ঠিত করেই সন্তুষ্ট হতে চায় না, তারা চায় এমন একটা স্থায়ী পদ্ধতি, যাতে তাদের সন্তানরা কোন কাগজ দলিলের ভিত্তিতে 'হারামজাদা' না থাকে।

বরং এই ঘৃণ্য গলিত জঘণ্য কলংকিনীদের 'বিষফল'দেরকে জাতে ওঠাবার জন্য তারা সভ্যতার চিরন্তন রীতি ও পরিচয়কে টেনে নামাতে চায় তাদেরই স্তরে। শাহজাদা আর হারামজাদা বলতে কিছু থাকবে না সমাজে। থাকবে না পাপ-পুণ্য বলতে কিছুই। সিঙ্গেল মাদারজাত সন্তান আর শুদ্ধ মাদারজাত সন্তানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

যদি মাননীয় মন্ত্রী দ্বিতীয় কাজটাও করে যান, তাহলে সমতা সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় অবদান (?) রেখে যেতে পারতেন তিনি। সমাজের অন্ধকার মহলে বসে যারা রাত-দিন ভানু-মতি খেল খেলেন, সেদিন হয়তো গণিকাদের মতো এই প্রেমিকারও মিডিয়ার সামনে এসে তাদের প্রেমকালীন প্রসবিত সন্তানদের জন্য এমন কোন গণিকা চরিত্রের মূল্যবান দাবী জানাবেন।

সেই সাথে মহান মন্ত্রী আরো একটি মহৎ (?) অবদানও রাখতে পারবেন। তাহলো, ইসলামের নবী, বিশ্ব মানবতা ও সভ্যতার অহংকার হযরত মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলে গেছেন- কিয়ামতের অন্যতম একটি আলামত হলো, 'দাসী তার প্রভুকে প্রসব করবে'।

অর্থ্যাৎ গণিকাদের সন্তানরাই একসময় অর্থ-বিত্ত- নেতৃত্বে এতোটা উপরে ওঠে যাবে যে, তারা তাদের পতিতা মায়েদেরকে পর্যন্ত শাসন করবে। মাননীয় মন্ত্রী কিয়ামতের একটি আলামকেই এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দিলেন।

সেই সাথে এও সত্য, মানুষের সৃষ্টিকর্তা দয়ালু আল্লাহ, মানব জাতির সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে যিনি সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও যথার্থরূপে অবগত। তিনি মানুষের জন্য সম্পদ বণ্টনের যে পদ্ধতি পাক কুরআনে বলে দিয়েছেন, তাতে এই নতুন মাত্রা যোগ করে মাননীয় মন্ত্রী কী করলেন? তাও আবার গণিকাদের মতো জঘণ্য খোদাদ্রোহী পাপীদের ঘৃণ্যতম পথ ও জীবনধারাকে রক্ষার জন্য?

জানি না, এই ঘটনা এ দেশের সভ্য সুশীল মা-বোনদের চির প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাকে কোথায় নিয়ে গেছে। কিয়ামত তো আসবেই। তবুও কিয়ামতকে সমাদর করে এভাবে আলিঙ্গন করার এই রুচি সত্যিই আমাদেরকে অবাক করেছে; হত্যা করেছে দেশের স্বাভাবিক সুস্থ ও বৈধ জীবন যাপনে বিশ্বাসী সকল মানুষের চিরন্তন মর্যাদা ও সম্মানবোধকে ।

বলুন, মাননীয় মন্ত্রীর এই আশ্বাসবাণী আর রমণী গণিকা মাদারদের এই আস্ফালনের পর এই মাটিতে আর কোন সভ্যতা ঘর বাঁধবে কি? অতএব, শুভ গণিকাবৃত্তি-বিদায় মানব সভ্যতা।

ঘরনীরা যেভাবে 'ওয়ার্কিং ওমেন' হলেন

এখন যেমন পূবে গরম হাওয়া বইছে নারী স্বাধীনতার, হৃদয়কাড়া মায়াবী কণ্ঠে এখন যেমন নারী অধিকারের জিগির চলছে পূবের প্রতিটি দেশে, একদা আমেরিকাও দুলে ওঠেছিল এই শেয়াল-সুরের মায়াবী কান্নায়। খৃষ্টাব্দ অষ্টাদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত আমেরিকাও পুষ্ট ছিল পারিবারিক সুশৃঙ্খল সভ্যতার পুষ্টিতে। বিশ্বাস ও বন্ধনের কোমল সূত্রে তারাও ছিল গ্রথিত। আমেরিকার নারীরাও সংসারী ছিল। ঘরদোর গোছাত তারাও হৃদয়ের মাধুরী মেখে। তারাও অকৃত্রিম মাতৃত্ব দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলতো নাড়ি ছেঁড়া ধন হৃদয়ের টুকরো সন্তানদের। প্রয়োজনে বাবা, ভাই ও স্বামীকে সাহায্যও করতো। এ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি আমেরিকার মাটি ও নারীর জীবন।

গত দু'শতাব্দীতে বিস্তর ব্যবধান এসেছে আমেরিকার জীবন ও সভ্যতায়। বদলে গেছে নারীর রূপ। বদলে গেছে পারিবারিক ব্যবস্থা।

আর এই বদলে যাওয়াকে তারা নাম দিয়েছে 'নারী স্বাধীনতা'। ইতিহাস বলে, খৃষ্টাব্দ ১৮০০-এর পূর্ব পর্যন্ত আমেরিকা ছিল একটি কৃষি রাজ্য। শতকরা নব্বই জনই কৃষিকর্ম ও কৃষিজাত নানা ধরনের কর্মসূচির সাথে যুক্ত ছিল। তারা দৈনন্দিন জীবনের উৎপাদনজাত সকল দ্রব্যেরই নিজেরা চাষ করত। দেশীয় পণ্যে জীবনযাপন ছিল তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাদের জীবনযাত্রার বাইরের দিক নিয়ন্ত্রণ করতো পুরুষরা, আর ঘরদোর সামলাতো নারীরা। তাছাড়া হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, গৃহপালিত পশু-পাখির লালন চর্চায়ও তারা সচেষ্ট ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের সূচনায় দোলা লাগলো আমেরিকানদের জীবনব্যাপী। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ। প্রেসিডেন্ট জেফারসন ইউরোপের সাথে আমেরিকার বাণিজ্য সম্পর্ক বাতিল মর্মে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। ফলে ইউরোপ থেকে কাপড় আমদানির পথ রুদ্ধ হয় আর আমেরিকার জন্য উন্মোচিত হয় টেক্সাইল ইন্ডাস্ট্রি খোলার পথ।

খৃষ্টাব্দ ১৮১৪ সালে বোস্টেন-এর 'ফ্রান্স কিবোট লেভেল' সর্বপ্রথম ফ্যাক্টরী চালু করে। এতে করে অভ্যন্তরীণ শিল্প ও পারিবারিক পেশা চরমভাবে ঝাঁকুনী খায়। উৎপাদনে গতিশীলতার পাশাপাশি মান উন্নয়নে ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়। 'লেভেল' ফ্যাক্টরী খোলার পর মুখোমুখি হয় ওয়ার্কার্স সংকটের। ফ্যাক্টরী চালাতে হলে চাই প্রচুর শ্রমিক। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তারা একটি সহজ ও সুলভ পথ আবিষ্কার করলো। তারা ভাবলো, কিষাণদের অবিবাহিতা কন্যা বিধবা ও ভরসাহীন দরিদ্র নারীদেরকে এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়। এতে দু'টি অতিরিক্ত লাভ আছে–

১. তাদেরকে অল্প পারিশ্রমিকে অধিক পরিমাণ খাটানো যাবে।

২. তারা কাজের প্রতি উৎসাহী। ফলে সংগ্রহ করাও হবে সহজ।

এক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তাহলো, এদের মা-বাবাকে বুঝিয়ে এই মর্মে আস্থা অর্জন করা, তারা কর্মক্ষেত্রে সার্বিকভাবেই নিরাপদ থাকবে। অতঃপর ফ্যাক্টরী পক্ষ মেয়েদের জন্য আলাদা 'নারী বোর্ডিং' নিমার্ণ করে। ফলে এই নবতর চিন্তা বাস্তবায়নের কোন বেগ পেতে হয়নি।

ঘরবাসী নারী। বয়সে তন্বী-তরুণী। গরুর ঘাস-পানি সংগ্রহ আর মুরগীর খোরাক আয়োজনে কখনো ক্লান্ত কখনো বা হতাশ। এরই মধ্যে যখন ডাক এলো শহরে যাবার, মন পাখিরা নড়ে উঠলো মুহূর্তে। পথে নেমে এলো সখে, স্বপ্নে ও অপারগতায়। জমে উঠলো কলকারখানা। মাঠে আর একেলা 'লেভেল' কোম্পানিই রইল না। সারি সারি ফ্যাক্টরি গড়ে উঠলো। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিসই দেশীয় কারখানায় উৎপাদিত হতে লাগলো।

ধীরে ধীরে গ্রাম ও কৃষি খামার ফিকে হতে লাগলো। শিল্প ধীরে ধীরে শহরমুখী হতে লাগলো। তার পিছু পিছু শহরমুখী হতে লাগলো শ্রমিকরাও। ক্রমাগত বসতিও স্থানান্তরিত হতে লাগলো গ্রাম ছেড়ে শহরে। প্রাচুর্য উদারতার সাথে বিলাতে লাগলো তার ধনভাণ্ডার। ধনের টানে মানুষ তার আজন্ম ভালোবাসায় লালিত ঘরবাড়ি ছাড়তে লাগলো। একটা সময় ছিল, যখন ক্ষুধার আবদার রক্ষা করতে গিয়ে নারী- পুরুষ সকলকেই খামারে কাজ করতে হয়েছে। তারপর শিল্পের ডাকে সাড়া দিয়ে শহরে এসেছে তারাই, যারা বিত্তহীন তরুণী, বিধবা নারী, স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় আশ্রয়হীন সন্ত ানদের হতভাগিনী জননী।

গভীর মনোযোগ, মমতা ও নিষ্ঠা ঢেলে দিয়ে তারা শিল্পকে শক্ত করে তুলেছে। অবিবাহিতারা এই শিল্প ও বাণিজ্য কর্মকে নিজেদের জীবনের অংশ বানিয়ে নিয়েছে। বিয়ে অবধি পড়ে রয়েছে কারখানায়ই। অনেকে তো আর বিয়ের মতো বিশাল দায়িত্ব– পথে পা বাড়াতেই সাহসী হয়নি। যারা সাহসী হয়েছে, তারাও স্বনির্ভরতার ছুতোয় বেশ দেরীতে বিয়ে করেছে। এতে করে পারিবারিক জীবন দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

বিবাহিতা নারীগণ ঘরে বসে তাদের সন্তানদের দেখাশোনা করতো। কৃষি ও পারিবারিক পেশা ভেঙে পড়ার পর তারা তাদের সন্তানদের অনেক বেশি সময় দেয়ার সুযোগ পায়। দেখা গেছে, ১৯০০ ঈসায়ী সাল নাগাদ বিবাহিতা নারীদের মধ্যে যারা কাজের জন্য ঘরের বাইরে যেতো, তাদের সংখ্যা ছিল ৫.৬। কিংবা তার চেয়ে কম। কোন বিবাহিত নারী কারখানায় কাজ করতে গেলে মনে করা হতো তার স্বামী অলস-অকর্ম কিংবা নেহাত দরিদ্র।

বিবাহিত নারীরা ব্যাপকভাবে 'ওয়ার্কিং ওমেন ফোর্সে' অংশগ্রহণ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪ ঈ.) সময়। কারণ, তখন পুরুষরা যুদ্ধে চলে গিয়েছিল। ফ্যাক্টরীগুলো হয়ে পড়েছিল শ্রমিকশূন্য। আর এই শূন্যতা শুধু অবিবাহিতা নারীদের দ্বারা পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। ফলে বিবাহিতা নারীদেরকে কারখানামুখি করতে মালিকরা নানাভাবে উৎসাহিত করে। কোমলমনা নারীরা তো বশে থাকতে বেশি সময় নেয় না কোন কালেই। এক্ষেত্রেও তারা তাদের কোমল চরিত্রের ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ন করেনি। তাই দেখা গেছে, ১৯০০ সালে যেখানে নারী শ্রমিকের হার ছিল মাত্র ৫.৬, সেখানে ১৯১৯ সালে নারী শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ২৫ ভাগ। এই সংখ্যা শুধুই বিবাহিতাদের। অধিকন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাদের মনেও প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। শুধু কারখানাই নয়, তারা প্রতিরক্ষা ফৌজেও ভর্তি হতে থাকে। এ সময় ১৩ হাজার নারী শুধু নেভিতে অংশগ্রহণ করে।

১৯৩০-এর দশকে আমেরিকায় অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি হয়। ১৯২৯ সালে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩.২, সেখানে ১৯৩২ সালে সে সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩.৬। আমেরিকান ইতিহসের ভাষ্য মতে, এ সময় বেকার সংখ্যা ছিল এক কোটি ষাট লাখ– যা তৎকালীন জনশক্তির এক তৃতীয়াংশ। এই পরিস্থিতিতে সংসারের কর্ণধার পিতা যখন বেকার হয়ে পড়ে, তখন সংসারের যাবতীয় দায়ভার এসে পড়ে মা ও কন্যাদের উপর। এরও একটা চমৎকার রহস্য আছে। রহস্যটি হলো, মেয়েদের জন্য কাজ পাওয়া যতটা সহজ,

পুরুষদের জন্য কাজ পাওয়া ঠিক ততটা কঠিন। কারণ, মেয়েদের দীর্ঘ সময় কাজ করিয়ে স্বল্প পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় করা যায়। পক্ষান্তরে পুরুষ শ্রমিকদের বেলায় এই অবিচার করা যায় না। দেখা গেছে, অর্থনৈতিক ধস আর দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতির সময়ও শতকরা আশিজন স্ত্রীদের চাকুরি প্রথার চরম বিরোধিতা করে। এ সময় সাদা চামড়ার নারীদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ ওয়ার্কিং ওমেন ফোর্সের সদস্য হিসেবে কর্মরত ছিল।

তারপর আবার ডাক এলো যুদ্ধের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পুরুষরা আবার হাতিয়ার হাতে চলে গেলো যুদ্ধে। আবার হৈ চৈ পড়লো নারী শ্রমিকদের। বিবাহিতা-অবিবাহিতা সকলকেই কারখানায় ঢোকাতে মাঠে নামলো কোম্পানির লোকেরা। কিন্তু আমজনতা এর বিরুদ্ধে। কোম্পানিগুলো পড়ে মহাবিপাকে। তখন প্রশাসন ও মিডিয়া মিলে নামে নতুন যুদ্ধে। তারা যৌথ উদ্যোগে ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রচার করতে থাকে– নারীরা যদি ওয়ার্ক ফোর্সে অংশগ্রহণ না করে, তাহরেল দেশ কখনো জয়লাভ করতে পারবে না। তাছাড়া যে নারী আত্মনির্ভরশীল নয়, সে উন্নত নাগরিকও নয়। অধিকন্তু কর্মজীবী নারীকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে অবলা নারীকে ফাঁপিয়ে তুলে। সেই সাথে শুরু করে মিডিয়াবাজি। পত্রিকাগুলো নারী বিষয়ে নতুন নতুন ম্যাগাজিন বের করতে শুরু করে। এতে গল্প-কাহিনী ফাঁদে নারীকেন্দ্রিক। তাতে কর্মজীবী নারীকে সমাজের উন্নত সচেতন স্বনির্ভর ও মর্যাদাশীল নারী হিসেবে অংকন করা হয়। ফলে প্রচাণার ধোঁয়া, শ্লোগানের বিভ্রাট আর প্রশাসনিক ভেল্কিবাজিতে পড়ে নারীরা। একসময় ভাবতে শুরু করে সমাজে স্বীয় অধিকার নিয়ে মর্যাদার সাথে বাঁচতে হলে তাকে কর্মজীবী হতে হবে, হতে হবে 'ওয়ার্কিং ওমেন'। প্রচারণার এই তরল তেলে ষাট লাখ নারী ওয়ার্ক ফোর্সে অংশ নেয়। এদের অধিকাংশই ছিল বিবাহিতা। ১৯৪০ সালে কর্মজীবী নারীদের হার ছিল যেখানে ৩৬ শতাংশ, ১৯৪৫ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ। এ ছিল অভাবী আমেরিকার চিত্র।

তারপর আমেরিকার জীবনে এলো সমৃদ্ধি। সে ছিল ১৯৫০ সালের পরের কথা। পুরুষরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলো। ফিরে এলো সমৃদ্ধ আমেরিকায়। খানাপিনা, শিল্প উৎপাদনে পুষ্ট আমেরিকায়। কিন্তু তারা মুখোমুখি হলো নতুন সংকটের। যুদ্ধ ফেরত পুরুষদের এখন কাজ চাই। অথচ কর্মক্ষেত্রের প্রায় অধিকাংশই নারীদের দখলে। সরকার ও মিডিয়ার সুর বদলে গেল। কোমল সুরে ঘরনী নারীদের প্রশংসা শুরু হলো। সাধারণ জনতার মনোভাব

পরিবর্তনের চেষ্টা শুরু হলো। সন্তান-সংসারই নারীর মূলধন, গলা ছেড়ে সকল মিডিয়া এ কথা প্রচার করতে লাগলো কিন্তু তাতে খুব বেশি ফায়দা হলো না। কর্মজীবী নারীরা ওসব প্রচার-প্রোপাগাণ্ডায় কান দিলো না মোটেই। কারণ, ঠেকায় পড়ে একদিন যে পেশাটা গ্রহণ করেছিল, এখন সেটা তার অনিবার্য প্রয়োজন। জীবনযাত্রার যে সিঁড়িতে এখন সে দাঁড়ানো, তাকে যদি অনন্ত এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তবুও তার এই পেশাটা চাই।

অধিকন্তু আমেরিকান জনগণ সরকারের দ্বিমুখী চরিত্রও বুঝতে পারে। তারা টের পায় নারীদেরকে ঘর থেকে তারা 'স্বাধীন' করার জন্য বের করে আনেনি। এনেছে মজদুর ও শ্রমিক বানাবার জন্যে। মিডিয়ার প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ আস্থাহীন ও অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। সমৃদ্ধির পাখায় ভর করে উড়ে আসে টেলিভিশন। টেলিভিশন এই শ্রমজীবী নারীদের ঘরে ফেরাকে আরো কঠিন করে তুলে। কারণ, ১৯৬০ সালের জরিপে দেখা গেছে, শতকরা ৯০টি পরিবারে টেলিভিশন আছে। আর এই টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিনিয়ত পরিবারের সকলে বসে অনুষ্ঠান দেখে। বিনোদনের ফাঁকে ফাঁকে নতুন নতুন চমক নিয়ে হাজির হয় অভিনব যতো আধুনিক সামগ্রীর বিজ্ঞাপন। চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন দেখে নতুন জিনিস ছুঁয়ে দেখার নেশায় কেঁপে ওঠে নারীর বিলাসী মন। ফলে যারা ইতিপূর্বে নানা কারণে কাজ ছেড়ে ঘরে ফিরে এসেছিল, তারাও ওই আধুনিক সামগ্রী ঘরে তোলা, ঘর সাজাবার রসিক নেশায় ছুটে যায় কারখানায়, উৎপাদন খামারে।

কিন্তু কি পেয়েছে নারী? স্বাধীনতার সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে উল্টো শ্রমের বোঝা নিয়ে ঘরে ফিরেছে। কলজে ছেঁড়া ধন সন্তানদেরকে তুলে দিয়েছে টেলিভিশনের হাতে। কর্মজীবী মায়েদের সন্তানদের অবসর কাটে টেলিভিশনের কোলে। ক্রাইম গল্প দেখে তারা সহসা অপরাধী হয়ে ওঠে অজ্ঞাতেই। সংসার জীবন ভেঙে পড়েছে ক্রমাগত। কারণ, একজন নারীর পক্ষে অফিস, স্বামী-সন্তান ও ঘর নিয়ন্ত্রণ করা আদৌ সম্ভব নয়। তাছাড়া নারী যখন সংসারের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখতে শুরু করেছে, তখন সে স্বামীর উপরও কর্তৃত্ব খাটাতে শুরু করেছে। বলতে শুরু করেছে, তুমিও সন্তান-সংসার দেখো। এটা কি পুরুষের পক্ষে সম্ভব? সম্ভব না বলেই শান্তি বিদায় নিয়েছে সংসার জীবন থেকে। বেড়েছে বিবাহ বিচ্ছেদের হার। তালাকের হার এখন ৫০ শতাংশেরও বেশি। পক্ষান্তরে বিয়ে ও সন্তান প্রসবের হার প্রতিনিয়ত কমছেই। মা-বাবা ও সন্তানদের সমন্বয়ে যাপিত

পারিবারিক জীবনের স্থান দখল করে নিয়েছে Single parent family-জীবন। অর্থাৎ পিতা ও সন্তান কিংবা মা ও সন্তান ভিত্তিক জীবন।

এক সময় ক্ষুধার তাড়া খেয়ে অসহায় দরিদ্র পিতার কুমারী কন্যারা কারখানায় গিয়েছিল দু'মুঠো ভাতের সন্ধানে। তারপর সন্তানহীন বিবাহিতারা, তারপর সসন্তান বিবাহিতারা, তারপর সকল শ্রেণীর নারীরাই নেমে এসেছে কর্মজীবী পথে। এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্রমাগত নারীরা হাঁটছে সেই পুরনো পথেই। স্বনির্ভরতার মুলো ধরার উচ্ছ্বসিত নেশায় উন্নত আমেরিকার পুচ্ছ ধরতে গিয়ে বিশ্বব্যাপী নারীরা এখন ঘরবিমুখ। অথচ তারা কি জানে, এই সভ্য (?) আমেরিকাতেই নারীরা ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার, সেলসম্যান ইত্যাকার নিম্নমানের দায়িত্ব পালন করে অধিকাংশ নারীকর্মী। ক্যাশিয়ার আর প্রাইভেট সেক্রেটারীই সাধারণত তাদের চাকুরি জীবনের স্বর্গ। ম্যানেজার কিংবা মিনিস্ট্রিতে তাদের প্রাপ্তির হার খুবই নগণ্য।

পশ্চিমা নারীরা স্বাধীনতার মাকাল ফল ছিঁড়তে গিয়ে মা-বোন-কন্যা আর জীবনসঙ্গিনীর মতো মর্যাদাপূর্ণ সকল পথ হারিয়ে এখন যৌনখেলার পুতুল কিংবা লেবার ফোর্স। আর পূবের অবলা নারীরা দুর্দশার শিকার উবু হয়ে পড়া এই পতিত ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিয়ে বরং তারাও চোখ বন্ধ করে ছুটে যাচ্ছে তাদেরই পেছনে, তাদের চেয়ে আরো অধিক উদ্যমে। হয়তো সেদিন দূরে নয়, যেদিন পূর্ব-পশ্চিমে কোন পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু তখন কি এই পৃথিবীতে মানুষ থাকবে? [তথ্যসূত্র : লাহোর থেকে প্রকাশিত বেদার ডাইজেস্ট, মার্চ ২০০৫ ঈ.]

সভ্যতার ক্যানভাসে নারী ও মানবাধিকার

আধুনিক সভ্য জগতে দু'টি বিষয় সর্বাধিক প্রিয় ও আলোচিত। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার। মাতব্বরদের ভারি সখের পোষা প্রাণী এই দুটো এখন। তাই অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল পৃথিবী এখন মাতব্বরদের এই প্রিয় দুটি জন্তুর ঘাস-পানি সংগ্রহে রীতিমতো জান বাজি রেখে মরছে। এই গণতন্ত্রকে কে কতটা লাশের খোরাক দিতে পারলো, পিপাসায় দিতে পারলো কে কতটা বুকের তাজা খুন। অতঃপর থেমে থেমে ভিক্ষে চায়– আমাকে একখানা সনদ দিন না, মানবাধিকার সনদ! জীবন রক্ত সম্পদ সম্ভ্রম দিয়ে যদি মাতব্বরের মন ধরাতে পারে, তাহলে মিলবে সনদ একখানা। সোনার হরফে লেখা–'তোমার দেশের মানবাধিকার সন্তোষজনক'। তারপর বাজাও তালি–ইউরেকা, ইউরেকা...।

আজকাল যারা এই মানবাধিকার আর গণতন্ত্রের উদারপ্রাণ মহাজন, আমরা কি তাদের দেশের গণতন্ত্রের খবর রাখি কিংবা মানবাধিকারের? মহাজনদের বাড়িতে মানবাধিকাররা কেমন আছে? সেখানে কিভাবে বেড়ে ওঠেছে তারা?

দুবেলা ডাল-ভাত খেতে পেয়েছিল তো? সত্যি কথা কি, মাহজনদের বাড়ির মানবাধিকারের গায়ে যদি আপনি হাত দেন, তাহলে আপনি কেন পাষণ্ড সীমারের মাও চোখের পানি ধরে রাখতে পারবে না। ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আসা বিদ্রোহী হাড়গুলো, অপুষ্টিতে চুপসে পড়া নিতম্ব, পেটের বিমারে ফুলে ওঠা বিশ্রি উদর- কেমন লাগবে দেখতে?

এই বৃটেনের কথাই ধরুন। এখন তারাও মানবাধিকারের লাইসেন্সধারী বেপারী। কিন্তু একদা অখণ্ড বৃটেনে কেমন ছিলো মানবতার বাপ-দাদারা?

বৃটেনের কারখানায় যারা কাজ করতো দরিদ্র নারী-তরুণী-কিশোরী-শিশুরা, কেমন ছিলো সভ্যতার সে রঙিন ক্যানভাস?

ঐতিহাসিক সূত্র বলে, একদা বড় দুর্দিন ছিলো বৃটেনে মানবতার। কলকারখানার মালিকরা ছিলো সীমাহীন জালেম। তারা শ্রমিকদের বাধ্য করতো তাদের স্ত্রী-কন্যাদেরও সঙ্গে আনতে এবং কাজে অংশ নিতে। পারিশ্রমিক ছিলো নামে মাত্র। শ্রমের মাত্রা ছিলো কেমন– ঈ. ১৮৩১ সালে বৃটেনের পার্লামেন্ট কমিটির সামনে প্রদত্ত এক শ্রমিকের জবানবন্দী শুনুন। তার নাম সেমভিল কোলসন।

প্রঃ কারখানায় যখন কাজের চাপ পড়ে, তখন মেয়েরা কখন কাজে যায়?

শ্রমিক : ভোর ৩টায় কাজে যায়, ফিরে রাত ১০টায়।

প্র : এই ঊনিশ ঘণ্টা কাজের মাঝখানে রেস্ট এবং খানাপিনার জন্য কতটুকু সময় দেয়া হয়?

শ্রমিক : নাস্তার জন্য ১৫মিনিট, খাবার জন্য আধ ঘণ্টা আর চায়ের জন্য ১৫ মিনিট।

প্র : মেশিন পরিষ্কার করার জন্য কী আলাদা সময় দেয়া হয়?

শ্রমিক : না। অনেক সময় খানা ও নাশতার সময় মেশিন পরিষ্কার করতেই শেষ হয়ে যায়। তখন মেয়েরা খাবার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

প্র : এতো সকালে বাচ্চাদেরকে ঘুম থেকে ওঠাতে কষ্ট হয় না?

শ্রমিক : মহাকষ্ট হয়। ঘুম থেকে তুলে সোজা বিছানার উপর দাঁড় করাই। কাপড় পরাই। তারপর টলতে টলতে তারা কাজে যায়।

প্র : বিছানায় কতক্ষণ থাকতো তারা?

শ্রমিক : ঘরে ফিরতেই সামান্য কিছু খাবার মুখে তুলে দিয়ে এগারটার দিকেই শুইয়ে দিতাম। আর স্ত্রী রাতভর জেগে থাকতো। ঘুমালে যদি সজাগ না পাই, তাহলে এরা সময় মতো কাজে যেতে পারবে না।

প্র : তার অর্থ, বাচ্চারা ৪ ঘণ্টার বেশি ঘুমাতে পারতো না?

শ্রমিক : হ্যাঁ, কাজের চাপ বেড়ে গেলে তাই হতো।

প্র : সাধারণত কাজের রুটিন কি?

শ্রমিক : চৌদ্দ ঘণ্টা। সকাল ছয়টা থেকে রাত আটটা।

প্র : বাচ্চারা এতো পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না?

শ্রমিক : হ্যাঁ, অনেক সময় তো খাবার মুখে রেখেই ঘুমিয়ে পড়ে।

প্র : এই কঠিন পরিশ্রমের সময়ও কি কোনরূপ অত্যাচার, অমানবিক কোন আচরণ করা হয়?

শ্রমিক : বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়লে বেত্রাঘাত পর্যন্ত করা হয়।

প্র : তোমার সন্তানরাও কি বেত্রাঘাত খেয়েছে?

শ্রমিক : সকলেই বেত্রাঘাত খেয়েছে। আমার বড় মেয়েকে বেত্রাঘাত করায় আমি অভিযোগ করতে চেয়েছিলাম। মেয়ে বললো, আব্বু অভিযোগ করো না, তাহলে যদি কাজ ছিনিয়ে নেয়, কি করে বাঁচবো।

প্র : সাধারণ অবস্থায় মজদুরী কেমন পাও?

শ্রমিক : সপ্তাহে তিন শিলং।

প্র : কাজ বেশি থাকলে?

শ্রমিক : তিন শিলং-এর সামান্য বেশি।

এই হলো সভ্যতার রঙিন ক্যানভাস বৃটেনের প্রাচীন রূপ। কবি থেমসহেত তার কবিতায় নির্মম এই শিল্প বিপ্লবের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে–

আঙ্গুলগুলো ভেঙ্গে চুরমার
পদযুগল অলস, রক্তবর্ণ
আধ-বিবস্ত্রা এক নারী, উপবিষ্ট
ঝুঁকে আছে প্রবল ধ্যানমগ্নতায়–
হাতে সুঁই-সুতো, ক্রমাগত বুনছে কাপড়।
তার চারপাশে দারিদ্র ক্ষুধা ও ধূলোর মিছিল
অথচ কণ্ঠে তার সুরেলা সংগীত–
কাজ চাই, কাজ চাই, কাজ...
নেমে আসে অনন্তর তারার মিছিল
এখন রজনী গভীরা
আহা, 'কৃতদাসী হতাম যদি' কণ্ঠে আর্তনাদ
আমার কাজ বুঝি শেষ হবে না কোন দিন!
এর বিনিময়ে কী পায় নারী?

ঘাসের কর্কশ বিছানা... ।

মোটা আটার তৈরি রুটির টুকরো

উপরে ভাঙা চাল, নীচে খড়ের শয্যা। [সূত্র : বেদার ডাইজেস্ট, মার্চ ০৫ ঈ.]

এই যাদের অতীত; তাপমাত্রা ৮০-এর উপর; অথচ অসহায় শ্রমিকরা ১৪ ঘণ্টা কাজ করে পেট ভরে যে দেশে খাবার পায় না, তারাই বলে ইসলামে মানবাধিকারের কোনো গুরুত্ব নেই।

শোনো! আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছিলেন একটি আঙ্গুর বাগানের পাশ দিয়ে। সঙ্গীগণ চিৎকার করে ওঠলেন, ভেতরে যাবেন না ইয়া রাসূলাল্লাহ। কী হয়েছে শুনি! ঐ যে উটটি পাগল হয়ে গেছে। ঘাবড়ালেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । এগিয়ে গেলেন। অশান্ত মূক উটটির মাথায় হাত রাখলেন। কান পেতে ধরলেন তার মুখের কাছে। ফিরে এসে ডাকলেন এর মালিককে। বললেন, তুমি এই উটটির প্রতি অবিচার করছো। ঠিকমতো খাবার দিচ্ছো না। আবার শ্রম নিচ্ছ তার সাধ্যের বাইরে।

: আমি এখন কী করবো হুজুর? কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

: একে ঠিকমতো খেতে দেবে। সাধ্যের বাইরে কাজ নেবে না। এ যদি না পারো, ছেড়ে দেবে তাকে। সেই তার রিযিক কুড়িয়ে খাবে।

এ হলো ইসলামে পশুর অধিকার। এর সাথে মিলাও তো দেখি তোমাদের মানবাধিকার। কেমন পাংশুবর্ণ দেখায়।

মাইন্ড করো না হে আমার বন্ধু সভ্যতা! আজব আলী মাতব্বরের কাক-কৃষ্ণ মেয়েটির নাম শুভ্রা-দ্বাদশী। অথচ এখনো সে হাসলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ওই কাকবর্ণ ঝিলিক।

তোমাদের মানবাধিকারের কোমল পরশে যেমন কাঁদে কাশ্মীর, কাঁদে আফগান, কাঁদে ফিলিস্তিন, কাঁদে ইরাক, কাঁদে না কেবল তোমাদের পাষাণ মানবাধিকার, অতিসভ্য সভ্যতা। তাই বলি, বন্ধু! সবই তো পেলে। শুধু মানবতা পেলে না।

সাবেক বিচার পতি মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানীর জীবন সঙ্গিনী মুহ্তারামা উম্মে ইমরান

আমাদের মাঝে কখনও বিবাদ হয়নি

[বর্তমান মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান জ্ঞানপুরুষ আন্তর্জাতিক ফকীহ্ হাদীস, ইসলামী অর্থনীতি ও আইন শাস্ত্রের বিরল ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মুফতী মাওলানা তকী উসমানীর জীবনসঙ্গিনী মুহতারামা উম্মে ইমরান। জগদ্বিখ্যাত এই মহান মনীষীর অভিজ্ঞ ভাগ্যবতী ঘরনীর একটি একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন ড. উম্মে মুহাম্মদ। এটি প্রকাশ করেছে পাকিস্তানের একটি মর্যাদাশীল দৈনিক পত্রিকা 'আল-ইসলাম'। সাক্ষাৎকারটির সতরে সতরে ছড়িয়ে আছে ঈমানী নূর, চারিত্রিক সুবাস আর আদর্শ জীবনবোধের রাশি রাশি সন্দেশ। সাক্ষাৎকারটি আমার দেশের প্রতিটি মুসলিম ঘরনীর জন্যও হতে পারে এক অমূল্য উপহার- এই বিবেচনা থেকেই এর সরল-স্বচ্ছ অনুবাদ তুলে ধরছি আমরা]

পৃথিবী বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম করাচি (পাকিস্তান)-এর সুরভিত জ্ঞানের আঙ্গিনা অতিক্রম করতে গিয়ে মুখোমুখি হলাম এক কোমলদীপ্ত নারীর। তার গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ বিনয়নমিত উষ্ণ অভ্যর্থনায় ফোটায় ঝরে পড়ছিল সারল্য, সততা ও লজ্জাস্নাত পবিত্রতার শিশির, তৃপ্তি ও তুষ্টির ঝরনা বিধৌত যাপিত জীবনের গভীর উচ্চারণ 'আলহাম্‌দুলিল্লাহ'' মা-শা-আল্লাহ 'আর আল্লাহর শোকর' শ্রেণীর অকৃত্রিম শব্দগুলো আমোদিত করে তুলছিল আমাদের মন ও বিশ্বাসকে।

হৃদয়তন্ত্রীতে বারবার উচ্চকিত হচ্ছিল কবিকণ্ঠ-

'পবিত্র বাসনা নিষ্পাপ হৃদয় আর স্বভাব সততায় -

তোমার সারল্য মিশেছে গিয়ে সমুদ্রের সরলতায়।'

প্রশ্ন : প্রথমে আমরা আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় জানতে চাই।

উত্তর : আমার বাবা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। ভারতে বসবাসকালে করাচীতে ব্যবসায়িক কারণে বার বার আসতেন। আমার মুহ্তারাম শ্বশুর মুফতী শফী (রহ.)-এর সাথে তাঁর বেশ হৃদ্যতা ছিল। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি দারুল উলূম নানকে ছোটকালে কারী ইয়ামীন সাহেবের কাছে কুরআন মাজিদ পড়েছি।

প্রশ্ন : ছোটবেলার কোন স্মৃতি মনে পড়ে কি?

উত্তর : বিশেষ কোন স্মৃতি তো নেই। হ্যাঁ, যখন দারুল উলূম নানকওয়াড়ায় পড়ি, তখন আমি খুব ছোট। তাই 'দারুল উলূম' কথাটি ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারতাম না। বলতাম, দারুল দারুম। তারপর যখন আমার বিয়ে হলো আরেক দারুল উলূমের এক শিক্ষকের সাথে তখন আমার খান্দানের লোকের আমাকে ঠাট্টা করে বলত, ও দারুল দারুমকে ভালবাসে তো তাই ওখানেই গিয়ে পড়েছে।... সবই ভাগ্য।

প্রশ্ন : বিয়ে করলেন কবে?

উত্তর : ১৯৬৯ সালে। আর ১৯৭১-এ আমার বড় ছেলে ইমরানের জন্ম।

প্রশ্ন : আপনার সন্তান ক'জন?

উত্তর : তিন সন্তান। দুই ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে ইমরান আলেম হয়েছে এবং দারুল উলূমে পড়াচ্ছে। তাছাড়া ও এলএলবি ও পিএইচডিও করেছে এবং আল মীযান ব্যাংকের শরীয়া এডভাইজারও। ছোট ছেলে হাসসান হেফয শেষ করে এবার দাওরায়ে হাদীস (কামেল) পড়ছে। এদের ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা আমাকে আরও তিনজন সন্তান দান করেছিলেন। তারা খুব ছোটকালেই মারা গেছে। তবে আল্লাহ তায়ালা আমাকে সবর ও ধৈর্যের তাওফিক দিয়েছেন। তারা ইনশাআল্লাহ পরকালে আমাদের নাজাতের উসিলা হবে। হাদীস শরীফে আছে, নিষ্পাপ শিশুরা তাদের মা-বাবার জন্য সুপারিশ করবে। তারা এই দুনিয়াতে নেই। তবে আখেরাতে আছে এবং ভাল আছে। মানুষের কর্তব্য হলো, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা।

প্রশ্ন : আপনার স্বামী তো একজন মস্তবড় আলেম, বিশাল মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আপনি তাকে কেমন পেয়েছেন?

উত্তর : মা'শাআল্লাহ তিনি খুবই ভাল মানুষ। ইলম, আমল ও মানবতায় উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। মনে পড়ে না তার সাথে ঘর করতে গিয়ে আমার কখনও কষ্ট হয়েছে। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখেন। সফর তার প্রায় নিয়মিত রুটিন। তবুও আমাদের কষ্ট হয় না– আল্লাহর মেহেরবানী।

প্রশ্ন : তিনি তো খুব ব্যস্ত। তো আপনাদেরকে কী সময় দেন? এই মানে ঘর-সংসার বাচ্চারা...।

উত্তর : দেখুন, তিনি তো সারাদিনই ব্যস্ত থাকেন। কাজকর্ম পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে। ফজরের পর একসাথে ওয়ার্ক। তাছাড়া সকালের নাশতা ও দুপুরের খাবারও একসাথে খাই। আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়টা আমাদের সাথে কাটান। ঘর-দোরের খোঁজ-খবর নেন। সংসার ও বাচ্চাদের বিষয়-আশয় সম্পর্কে কথাবার্তা, শলা-পরামর্শ হয়।

প্রশ্ন : সন্তানদের লালন-পালনে মুফতী সাহেবের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলবেন?

উত্তর : সন্তানের দেখাশোনা, তরবিয়ত, শিক্ষা-দীক্ষা এগুলো তো মায়েদেরই দায়িত্ব। এ বিষয়ে সর্বদাই সতর্ক ছিলাম। পারিবারিক কাজে তাদেরকে আমি কখনও ব্যবহার করিনি। যাতে পূর্ণ সময়টাই পড়াশোনার পেছনে ব্যয় করতে পারে, সেই চেষ্টা করেছি। উভয় ছেলেই কুরআনে কারীম অত্যন্ত যত্নসহ হেফয করেছে। সবক আমি নিজেই শুনেছি। ছোট ছেলে এবার দাওরায়ে হাদীস পড়ছে। তার পড়াশোণার ব্যস্ততা প্রচুর। তারপরও প্রতিদিন বাদ এশা সামান্য হলেও কুরআন শরীফ শোনায় এবং আমি শুনি। তার সবদিকে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখি।

প্রশ্ন : মানুষ বলে, স্বামীর সফলতায় স্ত্রীরও অবদান থাকে। মুফতী সাহেবের সফলতার পেছনে আপনার কতটুকু অবদান আছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : জ্বি, কিছু তো আছেই। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো, আজ অবধি মুফতী সাহেবের কোন কাজে আমি বাধা হয়ে দাঁড়াইনি। ঘরে-বাইরে যখন যেখানে যেভাবে খুশি কাজ করেছেন, করে যাচ্ছেন। আমি কখনও কোন বিষয়ে অভিযোগ করিনি। অনেক বোন বলেন, মুফতী সাহেব

তো আপনাকে সময়ই দেন না। তারপরও আপনি খুশি– এটা কিভাবে? আমি বলি, খুশি হবো না কেন? তিনি যে দীনী কাজ করে যাচ্ছেন, আমি কি তার অংশ পাব না? নিশ্চয়ই আমি তার সওয়াবের অংশীদার। তিনি যতবেশি কাজ করবেন, আমি ততবেশি সওয়াব পাব। আর এ জন্যই পারিবারিক ফায়ফরমায়েশে তাকে আমি ব্যস্ত করতে চাইনি কখনও। কেননা, তিনি অনেক বড় কাজ করছেন। এই কাজে তার একাগ্রতা দরকার। আমি তুচ্ছ সাংসারিক কাজের আবদার করে তার সেই কাম্য একাগ্রতা ভাঙতে চাই না।

প্রশ্ন : আপনি কি আপনার শ্বশুর মুফতী শফী (রহ.)-কে পেয়েছেন? তাকে কেমন পেয়েছেন?

উত্তর : জ্বি, পেয়েছি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ। আমাদেরকে খুবই স্নেহ করতেন। আমার বিয়ে হয়েছিল আঠার বছর বয়সে। নিজের কন্যার মতো আদর করতেন। অসুখ-বিসুখ সমস্যা টের পেলেই পানি পড়ে দিতেন, দুআ দিতেন। আমার আব্বা আসলে প্রায়ই বলতেন, আপনি আপনার মেয়েকে উত্তম তালিম দিয়েছেন। তিনিও অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। তারপরও আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত পরিবারের লোকদের সাথে সময় কাটাতেন। এই সময়টাতে শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত আমাদেরকে নিয়ে বসতেন। আর ঘরের সবাইকে তাকিদ দিয়ে বলতেন, সবাই যেন মজলিসে উপস্থিত থাকি।

প্রশ্ন : একজন আলেমের পরিবার কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আসলে আজকাল অর্থের প্রতি লোভ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের মধ্যে হালাল-হারামের ভেদাভেদ নেই। সংসারে পেরেশানির মূল কারণই এটা। স্বামীরা ঘুষ খায়। কিন্তু আমি মনে করি, পুরুষরা নিজেরা ঘুষ খেতে চায় না। তারা বরং নারীদের চাপে পড়েই ঘুষ খায়। তাদের আবদার ও চাহিদা এতো দীর্ঘ হয় যে, ঘুষের অর্থ ছাড়া সেটা পূরণ করা সম্ভব হয় না। আজকের যুগের নারীরা সন্তানদেরকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয় না। তারা সন্তানদের দীনী কথাবর্তা শোনায় না। খাবারের পূর্বে, ঘুমের পূর্বে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মাসনুন দুআগুলো পর্যন্ত সন্তানদের শেখায় না। সকালে আগেভাগে ঘুম থেকে ওঠা, ফজর নামায পড়া এসব তো মায়েদের

কাছ থেকেই শিখবে। শিশুকাল থেকে এসব উত্তম গুণাবলীর উপর গড়ে তুললে বড় হয়ে আর বিপথগামী হয় না তারা। কিন্তু যথাসময়ে উপযুক্ত তালিমের অভাবেই একসময় তারা চমকের পেছনে ছুটে বেড়ায় এবং জীবন ধ্বংস করে ফেলে।

প্রশ্ন : বর্তমানকালে একজন মুসলিম নারী তার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবে কিভাবে? কিছু পরামর্শ দেবেন কি?

উত্তর : প্রথমেই আকার-আকৃতি শরীয়ত মোতাবেক রাখতে সচেষ্ট হবে। সর্বদা প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করার চেষ্টা করবে। সকল কর্মে পরকালের কথা ভাববে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কথা চিন্তা করবে। আজকালের মেয়েরা শুয়ে-বসে ঘুমিয়ে গল্প করে প্রচুর সময় বরবাদ করে। কিন্তু অতীতের মুসলিম নারীগণ এভাবে সময় খুন করতেন না। তারা সুন্নত তরীকায় জীবন-যাপন করতেন। ঘুম থেকে নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী কাজকর্ম করলে সময়ে বরকত হয়, ইবাদত-বন্দেগীও প্রচুর করা যায়। কিন্তু এখনকার মেয়েরা টিভি দেখে, নাটক-ড্রামা শোনে জীবনের মূল্যবান সময়গুলো ধ্বংস করে দেয়।

প্রশ্ন : আপনি আপনার সন্তানদেরকে কিভাবে গড়ে তুলেছেন, বলবেন কি?

উত্তর : হ্যাঁ, আমার নিয়ম হলো, বাচ্চারা কোন ভুল বা অন্যায় করলে প্রথমে মমতার সাথে বুঝাই। পুনরায় যদি একই অন্যায় করে, তাহলে কঠিনভাবে শাসাই। স্বাধীন ছেড়ে দিই না। ছোটকালেই জীবনের সকল মাসনুন দুআ শিখিয়ে দেই। এতে করে জীবনেও আর ভুলে না এসব দুআ। আর ছোট বয়সে মুখস্তও হয় দ্রুত। আলহাম্‌দুলিল্লাহ, আমার নাতি পর্যন্ত সকল দুআ মুখস্ত বলতে পারে। ঘুমানোর সময়, ঘুম থেকে ওঠে, গাড়ি চরা মাত্রই স্পষ্ট স্বরে দুআ পাঠ করবে। আর এগুলো হাস্য-রসের ভেতর দিয়েই সে শিখে ফেলেছে।

প্রশ্ন : আজকালের সন্তানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদর্শবান হয়ে ওঠে না কেন?

উত্তর : মায়েরা যথাসময়ে তরবিয়ত করে না। সময় চলে যাবার পর কেবল কপাল চাপড়ে আপেক্ষ করে। শিশুকাল থেকে যখন কোন মা তার সন্ত

ানকে নামাযমুখী করতে চেষ্টা করে না, তখন এই বাচ্চা বড় হয়ে আর নামাযমুখী হয় না। তাই ভাল আদর্শবান সন্তান পেতে হলে সময়মতো তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে বউ-শাশুড়ির ঝগড়া একটা চিরাচরিত অভ্যাস। এক্ষেত্রে পুরুষদের কী ভূমিকা রাখা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমি মনে করি, এক্ষেত্রে শাশুড়ির একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে। তার উচিত পুত্রবধূর কোন দোষ ছেলের কাছে না বলা এবং ছেলের সামনে ছেলের বউকে কিছু না বলা। বরং পুত্রবধূকে নিজের মেয়ের মতো আলাদা ডেকে দরদ ও মমতার সাথে তার ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেয়া। সংশোধনের পথ বলে দেয়া। ছেলের সামনে বউকে মন্দ বললে নানা ধরনের দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে, যা ক্রমাগত সংঘাত-বিবাদ সৃষ্টি করে। আর যদি ছেলে তার বউয়ের প্রতি অবিচার করে, তাহলে তাকে নিরালায় ডেকে বুঝানোর দায়িত্ব মায়ের। ছেলের সামনে পুত্রবধূর ভাল দিকগুলো তুলে ধরে পরস্পর মমতা, প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টিতে সহায়তা করতে হবে। বউকেও বুঝাতে হবে, তোমার স্বামী তোমার সুখের জন্য কত কষ্ট করে, তোমার প্রতি তার যত্নেরও অভাব নেই, মাঝে-মধ্যে কিছু বললে ভালোর জন্যই বলে...। এভাবে উভয় পক্ষকে সামলে রাখার দায়িত্ব শাশুড়ির। শাশুড়ি যদি ধৈর্য ও সতর্কতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে সংসারে বিতর্ক কিংবা বিবাদ থাকতে পারে না।

প্রশ্ন : ছেলেদের কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলবেন?

উত্তর : ছেলেদের কর্তব্য বিয়ের পরও মায়েদের কাছে বসা। তাদের খোঁজ-খবর নেয়া। স্ত্রীর হক-এর পাশাপাশি মায়ের হকও যথাযথভাবে আদায় করা।

প্রশ্ন : মুফতী সাহেব এবং আপনার মধ্যে কখনও তিক্ততা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছি কি?

উত্তর : (ঈষৎ হেসে) না, এমনটির সুযোগ কখনও হয়নি।

প্রশ্ন : আপনার জীবনের স্মরণীয় সময় কোনটি, বলবেন?

উত্তর : বিয়ের মুহূর্ত এবং আমার সন্তানদের জন্মের সময়গুলো আমার কাছে স্মরণীয় এবং সুখের আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন : বিয়ের পর মুফতী সাহেবের সংসারে যখন আসেন, তখন কোন বিষয়টি আপনাকে সবিশেষ আকর্ষণ-আকৃষ্ট করেছে?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ, মা-বাবার সংসারেও আমি খুব সুখে ও আয়েশে ছিলাম এখানেও সুখেই আছি। তবে এখানকার যে বিষয়টি আমাকে খুব বেশি আলোড়িত করেছে, তাহলো নিয়মানুবর্তিতা। এই সংসারে প্রতিটি কাজ যেমন রুটিন মতো করা হয়; খানাপিনা, ঘুম, গোসল সবই– তেমনি বউ-ছেলে শ্বশুর-শাশুড়ি সবার লেনদেনই পরিষ্কার।

প্রশ্ন : আচ্ছা, পড়াশোনার সময় পান কি?

উত্তর : খুব সময় পাই। দুপুরে খানাপিনার পর ঘুম না আসা পর্যন্ত পড়ি। তাছাড়া সকাল থেকেই তিলাওয়াত, মুনাজাতে মকবুল, দরুদ শরীফ, অযিফা সবই যথাযথভাবে আদায় করি। আমি ডাক্তার আবদুল হাই (রহ.)-এর মুরীদ। তার দেয়া আমলগুলো রীতিমতো পালন করি।

প্রশ্ন : মক্কা-মদীনা তো বহুবার গিয়েছেন। সেখানকার অনুভূতির কথা বলবেন কি?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ, প্রতি রমযানেই যাই। আমি আমার স্বামীকে বলে রেখেছি, আমার সখ কেবল মক্কা-মদীনা যিয়ারত। রমযান ও রবিউল আউয়ালে সেখানে মিটিং থাকে। আমাকে তিনি অবশ্যই সঙ্গে করে নিয়ে যান। বিশেষ করে রবিউল আউয়ালে ভীড় কম থাকে। সহজে আমল করা যায়। যখনই ভীড় কম থাকে প্রাণ খুলে তাওয়াফ করি। কিছুই তো করার নেই, আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ করি, দুআ করি, কাঁদি, খান্দান, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত জনদের জন্য দুআ করি।

প্রশ্ন : খানাপিনায় কী পছন্দ, বলবেন কি?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ, যখন যা পাই। তবে সবজি বেশি খাই।

প্রশ্ন : বাড়িতে বাগান করেন কি?

উত্তর : হ্যাঁ করি, নিজেই যত্ন নেই। অনেকে বলে, বউ থাকতেও আপনি এতো পরিশ্রম করেন। আমি বলি, মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে, তাকে সম্ভব হলে নিজের কাজ নিজেই করা উচিত। স্থবির হয়ে বসে থাকা জীবিত মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়।

প্রশ্ন : মুফতী সাহেবও তো বাইআত করেন। আপনি তার কাছে মুরীদ হলেন না কেন?

উত্তর : আমাকে কেন, আত্মীয়-স্বজন কাউকেই মুরীদ করেন না। আমি তো বলি। তিনি বলেন, এমনিই দীনের কথা শোন, আমল কর। আমি অবশ্য অত্যন্ত গুরুত্বসহ তার বয়ান-নসীহত-পরামর্শ শুনি। সে অনুযায়ী আমল করি। প্রতি রোববার মুফতী সাহেব দারুল উলূমে বয়ান করেন। আমি আমার ঘরে মাইকের কানেকশন লাগিয়ে রেখেছি। রীতিমতো বয়ান শুনি। আমার পরিচিত মহিলারা বলেন, আমরা কখনো কাউকে আপনার মতো এতো গুরুত্বের সাথে স্বামীর কথা শোনতে দেখেনি। আমার ছেলে তার বউকে বলে, আমরা জীবনে কখনও আম্মীকে আব্বার মেযাজের পরিপন্থী কোন কাজ করতে দেখিনি। আমিও তাই বলি।

প্রশ্ন : সর্বশেষ প্রশ্ন, আমাদের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : সর্বদাই দীনের উপর আমল করতে চেষ্টা করবেন। উলামায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দীনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন। সুন্নতের প্রতি সর্বদা যত্নবান থাকবেন। মানুষের হক কখনও নষ্ট করবেন না। বান্দার হক খুবই বড় বিষয়। যারা বান্দার হকের ব্যাপারে যত্নবান থাকে, তাদের সাথে কারও লড়াই হয় না, সংসার হয় শান্তির নীড়। পাঠকদের প্রতি এই আমার পয়গাম।

: আপনাকে অনেক অনেক শুকিরিয়া।

: আপনাকেও শুকরিয়া।

[সূত্র : খাওয়াতীনে ইসলাম]

আমার জীবনসঙ্গিনী আমার জীবনবন্ধু...

•••

[ভারতবর্ষের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, দীনী দাওয়াত, গবেষণা ও ইসলামী বিপ্লবের অগ্রপথিক, প্রথম সারির দেওবন্দী আলিম, নন্দিত মুহাদ্দিস, লেখক ও বাগ্মী আল্লামা মনযূর নুমানী (রহ.) এর ভাগ্যবান পুত্রধন মাওলানা মুহাম্মদ হাফীয নুমানী-এর এক ঈমানদীপ্ত স্মৃতিচারণ 'আমার জীবনসঙ্গিনী আমার জীবনবন্ধু'। তার এই নাতিদীর্ঘ স্মৃতিচারণে দীপ্ত হয়ে ফুটে ওঠেছে এক দীনদার মুসলিম পরিবারের প্রকৃত আদল। এ শুধু আলোকময় স্মৃতিকথাই নয়, রীতিমত অনুকরণীয় এক অমূল্য পাথেয় আমার দেশের প্রতিটি ঘরনীর জন্যই। আশা করি, আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ এতে ভিন্ন রকমের স্বাদ অনুভব করবেন।]

দাম্পত্যের টানা বায়ান্ন বছরের গভীর বন্ধন যখন এক পলকে ছিন্ন হয়ে যায়, তখন বিরহ হৃদয়ে বেদনার কী যে মাতম ওঠে, বুকে চেপে বসে কষ্টের কত কঠিন হিমাদ্রি, সে কথা প্রথম অনুভব করলাম গত ২০০৪ সালের ৯ জুলাইয়ে।

রাত তখন ১২ টা। রজনী গভীর। আমার জীবনে এক বেদনার শরবিদ্ধ মুহূর্ত। আমার জীবনসঙ্গিনী আমার চোখের সামনে কালেমায়ে তায়্যিবাহ পড়তে পড়তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে পড়ল আমার শক্তি, চিন্তা, অনুভূতি। তার বিস্ফারিত নয়ন দুটি কিভাবে বন্ধ করি আমি! এই সেই মায়াবী আঁখি জীবনে অযুত-লক্ষবার আমি আমার অপেক্ষায় অপলক অস্থির দেখেছি। আহ, মৃত্যু কত সত্য...।

তার পা দু'টি মিলিয়ে দেয়ার সাধ্যিও আমার ছিল না। আমি আমার কনিষ্ঠ আত্মজ হৃদয়ের টুকরো হারুন নুমানীকে বললাম, তোমার মায়ের পা দু'টি সমান করে দাও। কারণ, যখন তোমার দাদীজান ইন্তেকাল করেন, তখন তোমার দাদা আমাকে দিয়েই তার পা সোজা করিয়েছিলেন, আর আমিই ছিলাম তার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান।

মনে পড়ে, আমাদের সম্মানিত মুরুব্বীগণ যখন আমাদের বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন আমার বয়স একুশ বছর আর আমার জীবনসঙ্গিনীর বয়স আঠার বছর। তাছাড়া সময়টাও ছিল তখন অত্যন্ত নাজুক। দেশ বিভক্তির দগদগে ঘা থেকে তখনও ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছিল। তিন কোটি মুসলমান ত্রিশ কোটি অমুসলমানের রুদ্র দৃষ্টির সম্মুখে শুধুই আল্লাহ ভরসা করে পরম বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করে যাচ্ছিল। মুসলমানদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই ছিল জ্বলন্ত হুমকির শিকার। প্রতিদিনই কোন না কোন মুসলমানের দোকান লুট হওয়ার সংবাদ কাঁপিয়ে যেত আমাদের অস্থির চিত্তকে। নিষ্প্রভ প্রদীপের মতো কোন মতে সামলে আছেন মুসলমান ব্যবসায়ীগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যকে।

মাসিক আল-ফুরকান আর কুতুবখানা আল ফুরকানকে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে আগলে রাখছিলাম আমি আর আমার অগ্রজ মাওলানা আতিকুর রহমান সামভালী। কারণ, আব্বাজন, বড়বোন, আমরা দুই ভাই, আমাদের উভয়ের জীবনসঙ্গিনী আর আমাদের অনেক ছোট দুই ভাই বোনের জীবন ও জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ছিল এই প্রতিষ্ঠান। বড় সমস্যা ছিল এই, আল-ফুরকানের পাঠক শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন। আর ভারতে যারা অবশিষ্ট ছিলেন, তাদের মধ্যে খানাপিনা আর অনিবার্য পোশাক-পরিচ্ছদের পর ধর্মীয় বইপত্র কিনে পড়তে পারে এমন মানুষের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। বিশেষ করে এটা ছিল আব্বাজানের এই ফয়সালার ফসল, আমরা কোনক্রমেই পাকিস্তান যাব না। ভারতের মুসলমানদেরকে একা ফেলে যাব না। তাদের সাথেই **আছি** তাদের সাথেই থাকব। মরবও তাদের সাথেই।

আমর যখন আমার জীবনসঙ্গিনীকে প্রথমবার তুলে আনতে যাই, তখন আমাদের ছিল একসেট কাপড়, একটি বোরকা আর মরহুমা জননীর অবশিষ্ট সামান্য অলংকার ভেঙ্গে নতুন আদলে তৈরি করা ক্ষুদ্র উপহার। এই শানেই হাজির হলাম মুরাদাবাদের সামভালে। আর জীবনসঙ্গীনীর জন্য জাহিয হিসেবে প্রদত্ত একটি মশারি, একটি টেবিল, একটি নামাযের চৌকি আর একটি চেয়ার ট্রেনে করে আসছিল। কিন্তু তা রেলওয়ের দায়িত্বশীলদের বদান্যতায় চার সংখ্যা আটে উন্নীত হয়ে গিয়েছিল। পরে আমি যখন বিলটি দেখিয়ে পরের দিন তা সংগ্রহ করতে যাই, তখন রেলওয়ে ক্লার্ক বলেছিল—

কাগজে তো চার লেখা, এখানে আট। রসিকতা করে আমিও বলেছিলাম– রেলওয়ে কর্মকর্তাদের আরেকটু সদয় দৃষ্টি পেলে তো ষোলই হয়ে যেত।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এরই উপর নির্মিত হয়েছিল আমাদের দাম্পত্য জীবনের ইমারত। ক্ষমাময় দয়ালু প্রভু আমার জীবনবন্ধুকে ক্ষমা করুন, আমাদের ঘরে এসে সামান্য শুকনো রুটি আর সামান্য সবজি কিংবা ঝোল খেয়ে জীবন কাটিয়েছে; কিন্তু ঠোঁটের হাসি কখনো ঠোঁট থেকে আলাদা হয়নি। জীবনে কখনো অভিযোগ বাক্য আমি কেন, কেউই শোনেনি। বউ-শাশুড়ির বিবাদ-বিসম্বাদ তো অতি স্বাভাবিক বিষয় আমাদের সমাজে। আর শাশুড়ি যদি হয় সৎ, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু স্বভাবজাত দীনদারী, মা-বাবার আদর্শ শিক্ষা-দীক্ষা আর ধর্মীয় বই পুস্তকের গভীর অধ্যয়নের ফলে স্বভাব এতটা শিলিত ও মার্জিত হয়ে গড়ে ওঠেছিল যে, জীবনে একবারও পরস্পরে তিক্ততার সৃষ্টি হয়নি। তার মুখের অনাবিল মুচকি হাসি দেখে কেউ কোনদিন কল্পনাও করেনি– ইনি তার সৎ শাশুড়ি। আমি বলি, তার এই স্বভাবজাত পবিত্রতারই উপহার হলো, যখন এই সৎ শাশুড়ি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তার মস্তক ছিল আমার এই ভাগ্যবতী সঙ্গিনীর কোলে।

মনে পড়ে, এক সময় ‘আল ফুরকান’ যে প্রেস থেকে ছাপা হতো, সেখানে খুব ছুটাছুটি করতে হতো এবং এতে করে অনেক সময় কেটে যেত। পত্রিকা প্রকাশেও বিলম্ব হতো। কিন্তু আব্বাজানের মত ছিল, ছাপা ও কম্পোজ উন্নত হতে হবে। দেরী হয় হোক। ভাবলাম, নিজস্ব প্রেস ছাড়া মান ও সময়ের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা তখন অবস্থার সামান্য উন্নতি দান করেছিলেন। পেটভরে খাবার আর পরিচ্ছন্ন পোশাকেরও ব্যবস্থা ছিল ভালই। এই যখন ভাবছি, ঠিক তখনই আব্বাজানের এক একান্ত ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষী মরহুম হাফেয খয়রাতী সাহেব লক্ষ্ণৌ কাচারি রোডে তাবলিগী কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যে কিছু জমি দান করেন। আব্বাজানের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তির ফলে এই নবনির্মিত তাবলিগী মারকাজের পাশেই আব্বার জন্য একটি ছোট অথচ উন্নত বাড়ি নির্মাণ করেন এবং আব্বাজানের কাছে মনের ইচ্ছার কথা এভাবে প্রকাশ করেন– এখন বুড়ো হয়ে গেছি। আপনার খেদমতে গিয়ে তো নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে পারি না।

আপনি যদি এখানে চলে আসেন... । গভীর সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে। তাই মুখের উপর না করাও সম্ভব নয়। তাই আব্বাজান এভাবে বললেন : আমিও তো বুড়ো। আর আমি আমার দু'ছেলে ও তাদের বিবিদেরকে সাথে না হলেও দূরে রাখতে চাই না। হাফেয সাহেব বললেন : তাদের ব্যবস্থাও আমি করব। এবার আর 'না' করার কোন পথ থাকল না। তাই আমরাসহ কাচারী রোডে চলে আসলাম।

১৯৫৩ সালের কথা। একদিন তানভীর প্রেসের মালিক চৌধুরী নাফিস এডভোকেট সাহেব আমাকে বললেন, এই প্রেস আমি আর সামলাতে পারছি না। তুমি এর দায়দায়িত্ব বুঝে নাও। উদ্দেশ্য, আমি তার বেতনভুক্ত তত্ত্বাবধায়ক হবো। আমি তাকে নতুন প্রস্তাব দিলাম। বললাম, প্রেসটি আমাকে ভাড়া দিন। মেরামত করার দায়িত্ব আমার। মাস শেষে ভাড়া নিয়ে যাবেন। কথাবার্তা চূড়ান্ত হলো। প্রেস মেরামত করলাম। ভাড়া মাসে ষাট রুপী।

এই প্রেসটি হাতে আসার পর আল্লাহ তাআলা রিযিকের দরজা আরেকটু প্রশস্ত করে দিলেন। যেখানে সারাদিনে একবার দশ রুপীর নোট ছোঁয়া মুশকিল হতো, সেখানে কিছুদিন না যেতেই দিনে কয়েকবার করে দশ রুপীর নোট গুণতে লাগলাম। নাস্তা, খাবার আর আইরন করা সাদা কাপড়ের চিন্তা মাথা থেকে সম্পূর্ণরূপে উধাও হয়ে গেল।

আমরা দুই ভাই কাচারী রোডে এসে যে বাড়িতে ওঠি, বাড়িটি দ্বিতল হলেও ছিল নেহাত ছোট ও সংকীর্ণ। ভাইজানের তখন এক ছেলে। তার চেয়ে দুই বছরের ছোট আমার এক মেয়ে। আমার শ্বশুর সর্বদাই ছিলেন স্বচ্ছল-সরল জীবনের অধিকারী। বড় খোলামেলা বাড়িতে বসবাস করেছেন তারা সর্বদাই। অবশেষে মুরাদাবাদে বিশাল বড় বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন। এই বাড়ি সদস্যের তুলনায় সত্যিই অনেক বড়। কিন্তু আমার জীবনসঙ্গিনী আমাদের এই ভাড়া করা ক্ষুদ্র বাড়িতে এসে ভুলক্রমেও কারও কাছে নিজেদের 'বড়' বাড়ির কথা আলোচনা করেনি। অভিযোগ করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

১৯৫৬ সালে আমার তৃতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এ বছর প্রেসের উপর তলাটি আল্লাহ তাআলা খালি করে দেন। এ তলায় পূর্বের ভাড়াটিয়াদের

একই সংসারের পনের সদস্য বসবাস করতেন। বাসা খালি হবার পর আমি যখন স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে এসে ওঠি, তখন মনে হচ্ছিল যেন বিশাল বিরান প্লাটফর্মের এক কোণে বসে আছি আমরা এক ক্ষুদ্র পরিবার। বললাম, বড় বাসার প্রয়োজন ছিল। নাও, এই হলো বড় বাসা। তার চোখে পানি এসে গেল। বলল, এত বড় বাসা দিয়ে আমি কি করব। তখন আমরা খোলা বাতাস আসে এমন একটি বড় রুম আর একটি মেহমানদের রুম খোলা রেখে অবশিষ্ট রুমগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দিই। কিন্তু এখানে সবিশেষ বলার কথা হলো, ওই ছোট সংকীর্ণ বাসায় যেমন কোন অভিযোগ ছিল না, এই বড় বাসায় এসেও কোন বিশেষ উচ্ছ্বলতা নেই। সেই ফজরের সময় ওঠা, নামায, নাশতা তৈরি করা, ঘর-সংসার, বাচ্চাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সদা ব্যস্ত এক চঞ্চলা জীবন।

আমার জীবন সঙ্গিনীর কৈশোর কেটেছে স্বচ্ছলতা বরং ধনাঢ্যতায়। কোন কিছুরই অভাব ছিল না তাদের সংসারে। আর আমাদের এখানে এসে এই আলো, এই অন্ধকার...। কোন অভিযোগও নেই। আমার কাছে তো নয়ই, স্বীয় বাবা-মার কাছেও নয়। মহান আল্লাহর কাছেও নয়। 'তাছাড়া আমার পাপ-পঙ্কিল জীবনের উপর সর্বদাই তার সততা-পবিত্রতা আর ইবাদত-বন্দেগী রহমতের ছায়া হয়ে থাকতো। দেখেছি, প্রেসের উন্নতির কালটাতে আমি মাঝে-মধ্যে অর্ধ রাতেও ঘরে ফিরতাম। কিন্তু ভয়, কষ্ট কিংবা অপেক্ষা ও অস্থিরতারও ইঙ্গিত দেয়নি জীবনে কোনদিন।

একটি মজার কথা মনে পড়ল। আমার বড় মেয়ে মুদাছছিরার বয়স তখন এক বছর। আমরা ট্রেনে মুরাদাবাদ যাচ্ছি। সেকালে রিজার্ভিশনের প্রথা ছিল না। আমার সঙ্গিনী মহিলা কামরায় চলে গেল, আর আমি উপরে শোয়ার জায়গা পেয়ে দিলাম ঘুম। মুরাদাবাদ গাড়ি আসার পরও আমি নিঝুম ঘুমে। সে নেমে পড়েছে যথাসময়ে আর আমি ট্রেনে। মহিলা টিটি এসে তার কাছে টিকিট চাইল। সে আমার মেয়েকে টিটির কোলে তুলে দিয়ে বলল, একটু ধরুন! আমি টিকিট নিয়ে আসছি। উঁকি মেরে আমাকে খুঁজতে লাগল প্রতিটি কামরায়। অবশেষে এক কামরার সামনে এসে জাগ্রত এক যাত্রীকে বলল, ওই আঙ্গুর রঙের শাল মুড়ো দিয়ে যে ঘুমুচ্ছে তাকে একটু ডেকে দিন। বলুন, গাড়ি মুরাদাবাদ এসে পড়েছে। তারপর ও ফিরে এসে টিটির কাছ থেকে

মেয়েকে কোলে নিয়ে আমার প্রতি ইশারা করে বলল, দেখুন, ওই যে আমার টিকিট আসছে।

আল্লাহ তাআলা যখন অভাব দূর করে দিলেন, হৃদয়ের সুপ্ত সব বাসনা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে লাগল। নববধূর জন্য নববরের মনে যেসব স্বপ্ন ও সখ থাকে, তার সব কটিই একের পর এক আমার মনকে দোলা দিতে লাগল। মার্কেটের পাশ দিয়ে যাবার সময় কোন সুন্দর কাপড়ের উপর দৃষ্টি পড়ল, কিনে নিলাম জীবনসঙ্গিনী কিংবা আমার সন্তানদের জন্য। কিন্তু আমার বারবার এই একই অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমার সখের সেই বস্ত্রসেট আমার স্ত্রীর গায়ে ওঠতে দেখিনি। জিজ্ঞেস করলে হেসে উত্তর দিত, সেলাই করার সময় পাইনি। তারপর ক'দিন না যেতেই আবার আরেক সেট কিনে এনেছি। দেখেছি, তার ভাগ্যেও তাই জুটেছে। অথচ লক্ষ্য করেছি, অবহেলা আর ভুলে যাওয়াটা কেবল দামী কাপড়ের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। অন্যথায় মৌসুমের প্রয়োজনীয় সাধারণ কাপড় যখনই এনেছি, যথাসময়ে তা সেলাই করে পরে নিয়েছে।

এক ঈদের ঘটনা। অত্যন্ত সুন্দর নজরকাড়া একটি সেট তার জন্য এনেছি। এনেছি বাচ্চাদের কাপড়ও। কিছু নিজে সেলাই করেছে, কিছু দর্জিকে দিয়ে সেলাই করেছে। কিন্তু তার ঈদের কাপড় সেলাই করা হয়নি। বিশ রমযানের পর থেকে আমি প্রতি রাতেই তাগাদা দিই। সে বলে, এইতো কয়েক ঘণ্টার কাজ, করে ফেলব। আমিই সেলাব। চাঁদ ওঠার পর বললাম, কাপড়ের কি খবর? বলল, দীর্ঘ রাত। হাতের কাজগুলো শেষ করে রাতেই সিলিয়ে নেব। ঈদের দিন বাচ্চাদেরকে নিয়ে নামায পড়ে যখন বাসায় আসলাম, তখন দেখি– জানি না কবেকার আনা একটি নতুন সেট তার গায়ে। আমি নয়নভরে দেখছি তাকে। আমাকে ঈষৎ হেসে বলল, আপনার বন্ধুদের জন্য খাবার তৈরি করতে করতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আর দেখুন না, এটাও তো নতুন কাপড় আর এনেছিলেন তো আপনিই।

যেটাকে অপচয় মনে করত, সেটা ছুঁয়েও দেখত না। মিতব্যয়িতা, কৃচ্ছ্রতা বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কার্পণ্যকে ছুঁয়ে যেত। তাও অবশ্য শুধুই নিজের ক্ষেত্রে এবং কাপড়-চোপড়ের বেলায়। খানাপিনা আর আতিথেয়তায় ছিল বিশাল মন ও দরাজ হস্তের অধিকারী। যখনই বলতাম, আজ রাতে

আমার ক'জন বন্ধু এখানে খাবে। বলত, ক'জন এবং কি খাবে? ব্যাস, তারপর পাঁচজনের জায়গায় আটজন এসে হাজির হলেও খাওয়ার পর দেখেছি আরও চারজন খেতে পারত।

খুব বেশি বয়সে তো আমার ঘরে আসেনি। তারপরও শিক্ষা, নানা রকমের রান্নাবান্না, শত শিল্পের সেলাই কর্ম, হস্তশিল্প, সবিশেষ সুয়েটার এতটা দক্ষতার সাথে এত দ্রুত সেলাই করত, যে কেউ দেখতো অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। বাবার ছোট মেয়ে হওয়ার সুবাদে পিতার প্রাণখোলা যত্ন যেমন পেয়েছে, শিক্ষা-দীক্ষাও পেয়েছিল অপার। হস্তশিল্প ছিল তার মা এবং বড় দু'বোনের স্নেহের ফসল। ফলে প্রভাতে ওঠে নামাযের প্রস্তুতি, অন্যদেরকে জাগিয়ে তোলা, অতঃপর তিলাওয়াত, নামায, সময় পেলে তাফসীর পাঠ, ঘরে কাজের লোক না থাকলে নিজ হাতে নাশতার আয়োজন, বাচ্চাদের পড়া তৈরি, স্কুলে পাঠানো অতঃপর ঘরের সার্বিক যত্ন এমনভাবে নিতো, যা আমার কাছে রীতিমতো বিস্ময়কর মনে হতো।

সময় বয়ে চলেছে গঙ্গার পানির মতো। প্রেসও ধীরে ধীরে উন্নতি করেছে। এতে আমার অপচয় যতটা বেড়েছে, দেখেছি তার কৃচ্ছ্রতা ততোই শাণিত হয়েছে। আমি একবার এই নিয়ে অভিযোগ করলে বলল, আমিও যদি আপনার মতো দু'হাতে টাকা উড়াই, তাহলে তো একবছরে বাড়ি প্রেস সব বিক্রি করতে হবে। তাই বলে সে আমার অপচয়ের প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হয়নি, অভিযোগও করেনি। আর আমার অপচয় ও বাড়াবাড়িটা শুধু টাকার ক্ষেত্রেই ছিল না; অর্থ, ভালবাসা, শক্তি, মানসিক মেধা, বক্তৃতা, লেখালেখি অর্থাৎ সবক্ষেত্রেই ছিলাম উদার বরং অপব্যয়ী আর এটা যদি মন্দ কিছু হয়ে থাকে, তাহলে সত্যিই আমিও মন্দ ছিলাম।

আজ মনে পড়ে, জীবনে কতবার কত অঙ্গনে তার সাহায্যের প্রয়োজন পড়েছে। সবার আগে আমি তাকেই প্রস্তুত এবং সবচাইতে কাছে পেয়েছি। আব্বাজান ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ। বড় ভাই মাওলানা আতীকুর রহমান সামবালী অসুস্থ থাকতেন প্রায়ই। ছোট ভাই হাসসান আর সাজ্জাদ ছিল বয়সে আমার সন্তানদের মতো প্রায়। আর লক্ষ্ণৌতে তো আমাদের কোন আপনজন ছিল না, যাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাব। তাছাড়া প্রতিদিনই কোন না কোন সাহিত্য সামাজিক রাজনৈতিক কিংবা জাতীয় প্রোগ্রাম

থাকতোই। এ পথে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে আমার জীবনসঙ্গিনী।

১৯৬২ সালের ১২ মার্চ 'নেদায়ে মিল্লাত' -এর প্রথম সংখ্যা বের করলাম। বড় ভাই সুবিখ্যাত কলামিস্ট মাওলানা আতীকুর রহমান সামবালী ও ড. মুহাম্মদ আসিফ কাদওয়াই কলাম লিখতেন। ইলাহাবাদ থেকে হাসান ওয়াসেফ উসমানী আর পাটনা থেকে জহীর সাহেবকে নিয়ে এলাম। অবশিষ্ট সব দায়িত্ব রইল আমার কাঁধে। খানাপিনার কথা ভুলে গেলাম। প্রেসের ব্যবসা, স্বাস্থ্য, সন্তান, ঘর-ঘরনী সবই ভুলতে হলো। অতিরিক্ত দুই সহকর্মীর খানাপিনার ভার পড়ল গিয়ে মুহতারামা স্ত্রীর উপর। কিন্তু বিনা বাক্যে মেনে নিলো সবকিছু। ঘর, প্রেস, পত্রিকার বিরাট দায়ভার সাথে সন্তানদের পূর্ণ দেখাশোনা হাসিমুখে এমনভাবে সামাল দিতে লাগল, যে কথা ভেবে আজও লজ্জিত হই। বিনিময়ে পাঠকপ্রিয়তা পেল নেদায়ে মিল্লাত। স্বীকৃতি পেল 'নেদায়ে মিল্লাত' সমকালীন 'আল-হেলাল' হিসেবে। এর স্বীকৃতি ও প্রশংসায় পাকিস্তানের এক সমাদৃত সাপ্তাহিক পত্রিকার বরেণ্য সম্পাদক নেদায়ে মিল্লাতের প্রথম বর্ষপূর্তি সংখ্যায় সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন : "পাকিস্তানের কোন মর্যাদাশীল পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার চাইতে নেদায়ে মিল্লাতের হকার হওয়াটাও আমার দৃষ্টিতে অনেক বেশি গর্বের বিষয়।"

তারপর এলো ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী করীম ভাই ছাগলা ঠিক তারই মতো ইসলাম দুশমন মুসলিম ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর আলী ইয়াভরজঙ্গ মিলে মুসলিম ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে চক্রান্ত আটল 'মুসলিম' শব্দটি মুছে ফেলার নাপাক লক্ষ্যে। তাদের ওই চক্রান্তের বিরুদ্ধে চিৎকার করে ওঠলেন রাষ্ট্রের সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ। উর্দু প্রেসগুলো তপ্ত হয়ে ওঠল আপোসহীন বিপ্লবে। আমার গর্ব করার বিষয় হলো, জাতি ও ধর্মের এই ক্রান্তিকালে নেদায়ে মিল্লাত পালন করেছিল ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

১৯৬৫ সালের এই সংকটকালে ওল্ডভয়েজ মুসলিম ইউনিভার্সিটি নামে কনভেনশন ডাকা হয়। আমরা সিদ্ধান্ত নিই, এ উপলক্ষে আমরা নেদায়ে মিল্লাতের 'মুসলিম ইউনিভার্সিটি সংখ্যা' নামে একটি বিশেষ সংখ্যা বের কবব। যথাসময়ে ঘোষণা দিয়ে বসলাম। সরকারের ঘুম হারাম হয়ে গেল।

শুরু হলো আমাদের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা। জানতে পারলাম, হয়তো এই সংখ্যাটিই বের করতে দেবে না, অথবা জব্দ করবে। আমরা দমবার পাত্র নই। কারণ, পত্রিকা প্রকাশে বাধা দিক আর জব্দই করুক, তাতে আমাদের কি? আমরা চেয়েছি, আমাদের আত্মবিশ্বাসের উচ্চারণকে উঁচু করে ধরতে। আমরা আমাদের বিরুদ্ধে কৃত চক্রান্তের মোকাবেলা করতে চেয়েছি পূর্ণ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে। সে উদ্দেশ্য পত্রিকা বন্ধ বা জব্দ করলেও অর্জিত হবে।

চারদিক থেকে পত্রিকার চাহিদা ও তাগাদা আসতে লাগল। সংখ্যা প্রস্তুত হতে লাগল। তিনটি প্রেস থেকে একযোগে ছাপা হতে লাগল। পত্রিকার পাঁচ হাজার কপি ছাপা হলে আরএমএস-এর মাধ্যমে পাঠাতে লাগলাম। এতে শতকরা নব্বই ভাগ সফলও হয়েছি। অতঃপর এক রাতে অবশিষ্ট পত্রিকাসহই গ্রেফতার হলাম আমি। পত্রিকা যা পেল জব্দ করে নিল। আমাকে গ্রেফতার করল ডিআইআর-এর লোকেরা। সে এক কালো আইনের অধীনে গ্রেফতার হলাম, যাতে জামিনের কোন ব্যবস্থা নেই, ব্যবস্থা নেই মকদ্দমা চালাবারও।

জীবনের এই কঠিন প্রেক্ষাপটে আমার জীবনবন্ধু কী ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল, সেকথাই বলতে চেয়েছি আমি আজ। এই গ্রেফতারীর পর আমি নয় মাস রুদ্ধ ছিলাম কারাগারে। সে সর্বপ্রথম সিআইডিদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রেস থেকে লুকিয়ে পঞ্চাশটি পত্রিকা বের করে আনে। অতঃপর দীর্ঘ পথ ঘুরে আমার আব্বাজানের কাছে পৌঁছে দেয়। কনভেনশনের পর প্রেস কনফারেন্স করে সেখানে ড. আবদুল জলীল ফরিদী ও কাযী মুহাম্মদ আদীল আব্বাসী এই কপিগুলোই সাংবাদিক ও সুধীজনদেরকে দেখান। তারা জানান, সরকার দাবী করেছে, নেদায়ে মিল্লাতের প্রতিটি কপি জব্দ করা হয়েছে। অথচ সরকারের পক্ষে এটা সম্ভব হয়নি। এই যে তার প্রমাণ। এতে সরকার আরও শংকিত হয়। মুসলমানদের শক্তি, সাহস ও ঐতিহ্যের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস জ্বলে ওঠে আরেকবার।

অধিকন্তু আমার এই কারারুদ্ধকালে প্রতি শুক্রবার আমার জীবনসঙ্গিনী খাবার নিয়ে আসতো। জেলার ভদ্রলোক অল্প সময়েই অনুমান করতে পারেন, আমরা কোন শ্রেণীর লোক। ফলে আমার স্ত্রী-সন্তানরা প্রতি শুক্রবারে অন্তত

দু'ঘণ্টা কাটাতো আমার কাছে। পরে জানতে পেরেছি, মাঝে-মধ্যে জেলখানা থেকে সামানপত্র ও বাচ্চাদেরকে নিয়ে পায়ে হেঁটেও স্টেশন পর্যন্ত আসতে হয়েছে। কিন্তু সে কথা আমাকে কখনো বুঝতেও দেয়নি। তাছাড়া বাচ্চাদের পড়াশোনা, পর্দার ভেতরে থেকে প্রেসের হিসাব-নিকাশসহ আমার সকল দায়িত্ব আদায় করেছে আমার এই জীবনবন্ধু ঘরনী। সংসারে, রোজগারে, সংগ্রামে এক বিশ্বস্ত ভরসা আমার আজ অন্য জগতের বাসিন্দা।

একজন সৎ ও কল্যাণী নারীর সংস্পর্শ কত সৌভাগ্যের সওদা সেকথা কিভাবে বুঝাব। মনে পড়ে, যখন আমার বড় মেয়ের বিয়ের আয়োজন হচ্ছে, তখন আমাকে বলল, শুধু বিয়ের শাড়ি আনলেই হবে। আর কিছু নয়। বললাম, সে কি, বাকি সামান কোথায় পাবে? বলল, সবই হবে। যথাসময়ে দেখি কি তাকে আমি সখ করে যত মূল্যবান গহনা ও শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম সবগুলো এমন সুন্দর ও যত্নের সাথে রেখে দিয়েছে যেন এইমাত্র কিনে এনেছি। বলল, এগুলো আর কার জন্য বলুন। আমার এক পুত্র শাউন আর ছোট কন্যা আলিয়া যখনই মদীনা শরীফ থেকে দেশে আসতো, মায়ের জন্য মূল্যবান শাড়ি কিংবা দামী পোশাক অবশ্যই আনতো। আমি ভেবে বিস্মিত হই, আমার নাতনী নায়েলার বিয়ের সময় এসব উপহার ঠিক সেভাবেই উপস্থিত করল, যেভাবে আমার মেয়ের বিয়ের সময় করেছিল।

পাক-পবিত্রতা ছিল স্বভাবজাত। ইবাদত-বন্দেগী করতো গভীর মগ্নতার সাথে। খোদা ও খোদার বান্দাদের হক আদায়ে সদা সচেষ্ট এই আল্লাহর বান্দী– স্বামী আর এক স্ত্রীর বর্ধিত পঁচিশ সদস্যের বিশাল সংসারকে এতীম করে অবশেষে চলে গেল আপন ঠিকানায়, প্রভুর রহমতের কোলে। দুআ করি, মাবুদগো, মরহুমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও, আর মুসলিম উম্মাহর কন্যা-বধূদেরকে তার আদর্শ অবলম্বন করার তাওফীক দিও। আমীন!! [সূত্র : খাওয়াতীনে ইসলাম]
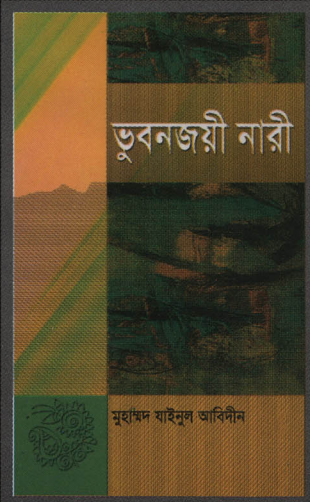
নাদিয়া বুক কর্ণার

■ design : najmul haider ■ shaj creation